দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দুকে তার একক শক্তিতে বলিয়ান হতে হবে

পৃঃ - ১১

মৌলবাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র আজ পশ্চিমবঙ্গ

পৃঃ - ২০

৬৯ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।। ১ ফাল্গুন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

করমুক্ত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ২.৫ লাখ থেকে বেড়ে হল ৩ লাখ টাকা

নতুন কর-কাঠামো

করযোগ্য উপার্জন	দিতে হোত	এবার দিতে হবে	সাশ্রয়ের পরিমাণ
৩ লাখ টাকা	৩০৯০ টাকা	শূন্য	৩০৯০ টাকা
৩.৫ লাখ টাকা	৮২৪০ টাকা	২৫৭৫ টাকা	৫৬৬৫ টাকা
৫ লাখ টাকা	২৩৬৯০ টাকা	১২৮৭৫ টাকা	১০৮১৫ টাকা
১০ লাখ টাকা	১২৮৭৫০ টাকা	১১৫৮৭৫ টাকা	১২৮৭৫ টাকা
২০ লাখ টাকা	৪৩৭৭৫০ টাকা	৪২৪৮৭৫ টাকা	১২৮৭৫ টাকা

বাজেট ২০১৭

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ১ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৩ ফেব্রুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : মোদীজী, আপনার পরাজয় নিশ্চিত
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা নেই যে, কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের অনুমতি সংবিধান দেয়নি
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

হিন্দুকে তার একক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১১

এ বাজেট আমার আপনার সকলের
▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৪

কেন্দ্রীয় বাজেট অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে
▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৭

মৌলবাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র আজ পশ্চিমবঙ্গ
▯ জিষ্ণু বসু ▯ ২০

ওঙ্কারে সবার অধিকার ▯ সুভাষ মোহান্ত ▯ ২১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত
▯ সলিল গেঁউলি ▯ ২৩

শ্রীলঙ্কায় নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২ রাখতে চায় মুসলমানরা ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ২৭

নানা দিক দিয়েই বর্তমান বাজেট অভিনব
▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৯

রাজনৈতিক দলের চাঁদায় কোপ ▯ ৩০

সুপরিকল্পিতভাবে পাল্টে ফেলা হচ্ছে জম্মুর জনবিন্যাস ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫-৩৬ ▯
সমাবেশ-সমাচার : ৩৭ ▯ রঙ্গম : ৩৯
▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
২০ ফেব্রুয়ারি
২০১৭

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২০ ফেব্রুয়ারি
২০১৭

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি : ভারতের লাভ-ক্ষতি

আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে সারা বিশ্বে এখন জোর চর্চা চলছে। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতির লাভ-ক্ষতি খতিয়ে দেখেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণয় রায় প্রমুখ।

বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE
PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমস্যা

গত এক সপ্তাহ ধরিয়া নাগাল্যান্ডের বড় দুইটি জেলা—কোহিমা ও ডিমাপুরে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। সেখানে সেনা মোতায়েন করিতে হইয়াছে এবং মুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াং-এর নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্র সরকারকে বিশেষ নির্দেশ দিতে হইয়াছে। পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হইয়াছে যে স্থানীয় একত্রিশটি পুরসভার নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াও রাজ্য সরকারকে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। নাগাল্যান্ডে গত ১৬ বৎসর স্থানীয় পুরসভাগুলিতে নির্বাচন হয় নাই। 'নাগা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট ৩৩ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে নাগাল্যান্ডে পুরসভাগুলির শীঘ্র নির্বাচনের আদেশ দিয়াছেন। ওই রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতির মঞ্চ 'নাগা হোহো' এই আদেশের বিরোধিতা করিতেছে। তাঁহাদের বক্তব্য—মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ জনজাতিগুলির প্রাচীন ঐতিহ্যে আঘাত করিবে। তাঁহারাও সংবিধানকেই সাক্ষী মানিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি, পৃথক রাজ্য বলিয়া স্বীকৃতির সময়েই নাগাল্যান্ডে সংবিধান সংশোধন করিয়া নাগা জনগোষ্ঠীগুলির ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। নূতন ধারায় (৩৭১-ক) বলা হইয়াছে, নাগাদের আইন, রীতিনীতি, ভূমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংসদের আইন আরোপিত হইবে না, যদি না নাগাল্যান্ড বিধানসভায় তাহা গৃহীত হয়। ঘটনা হইল, মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ আইনটি নাগাল্যান্ডের বিধানসভায় ২০০৬ সালে গৃহীত হইলেও নাগাজনজাতিদের মঞ্চ তাহা স্বীকার করিতে রাজি নয়। তাহাদের বিরোধিতায় নাগাল্যান্ডের অশান্তির আগুন এতটাই উত্তেজনাকর যে রাজ্য সরকারকে পুরসভাগুলির নির্বাচন বাতিল করিতে হইয়াছে।

অন্যদিকে 'নাগা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর বক্তব্য হইল—নাগাল্যান্ডের গ্রামীণ প্রশাসনে বহু পূর্বেই মহিলা সংরক্ষিত আসন চালু রহিয়াছে। তাহা হইলে শহরে এই আইনটি প্রয়োগ করিতে সমস্যা কোথায়? বিধানসভাতেও দুইবার বিষয়টি অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বাহির হইতে (সংসদে গৃহীত) আইন না-চাপাইবার শর্ত সেই ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হইবে। সর্বোপরি নাগা মহিলারাই এই সংরক্ষণ দাবি করিতেছেন। চার সন্তানের জননী ও নির্দল প্রার্থী হাখেলি টি উটসা যে-কোনো চাপ, এমনকী প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহার বক্তব্য— সংরক্ষণ চালু হইলে শুধু নাগা মহিলা সমাজই নয়, উপকৃত হইবে সমগ্র নাগা সমাজ। নাগা ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াই তাঁহারা সংরক্ষণ চাহেন। দুইটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নাই বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। 'নাগা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর এই যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রশ্ন হইল, নাগাল্যান্ড সরকার রাজ্যের মহিলা সমাজের এই দাবিকে কার্যকর করিতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে কিনা?

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। সারা দেশ এবং মুখ্যধারার সংবাদমাধ্যম এখন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন লইয়া এতটাই ব্যস্ত যে উত্তরপূর্বাঞ্চল, বিশেষত মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের বিষয়ে দেশের মানুষকে অবগত করিবার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলিরও এই বিষয়ে তেমন কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে না। উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমস্যাকে যদি নিজেদের সমস্যা বলিয়া মনে না করি তাহা হইলে স্বর্গতুল্য দেশের এই ভূ-ভাগ আমাদের বড় দুঃখের কারণ হইতে পারে। কেননা কাশ্মীরের থেকেও বেশি উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এই পূর্বোত্তর অঞ্চলে সক্রিয়।

সুভাষিতম্

স্বদেশে কষ্টমাপন্নে উদাসীনাস্তু যে নরাঃ।

নৈব চ প্রতিকুর্বন্তি তে নরাঃ শত্রুনন্দনাঃ।।

যখন দেশ বিপদের মধ্যে পড়ে, তখন যাঁরা উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন এবং প্রতিকার করতে এগিয়ে আসেন না, তাঁরা শত্রুদের আনন্দ দানই করে থাকেন।

সংরক্ষণের দাবিতে নাগা মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মেয়েদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন নাগা জনজাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর জঙ্গি আন্দোলনের জেরে পৌরসভার নির্বাচন বাতিল হয়ে গেলেও, নাগা মহিলারা তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াই ছাড়তে রাজি নন। চার সন্তানের জননী এবং নির্দল প্রার্থী হাখেলি টি উটসা তেমনই একজন মহিলা, যিনি যে-কোনো চাপ, এমনকী প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে যেতে চান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উটসা বলেন, 'নির্বাচন বাতিল হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমি আমার লড়াই চালিয়ে যাব।' কিন্তু মহিলাদের সংরক্ষণের দাবিতে কেন তারা এমন উত্তাল হয়ে উঠলেন? এই প্রশ্নের জবাবে উটসা বলেন, 'এটা ঠিক এখনও নাগা সমাজে মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেবার কোনো অধিকার' নেই। কিন্তু সময় বদলে গেছে। নাগা সমাজ পিছিয়ে থাকতে পারে না। অন্য অনেকের মতো আমিও নাগাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি বাঁচিয়ে রাখতে চাই কিন্তু সেই সঙ্গে মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও চাই।'

উটসা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতক। ডিমাপুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের প্রার্থী। ডিমাপুরের এক অর্ধশতাব্দী উত্তীর্ণ মহিলা সমিতির দায়িত্বভার সামলেছেন প্রায় ৯ বছর। মেয়েদের সংরক্ষণের প্রশ্নে তিনি কোনোরকম আপোশ করতে রাজি নন। তিনি বলেন, 'নারীর ক্ষমতায়ণ নিয়ে এখন সারা বিশ্ব ভাবছে। সুতরাং নাগা মহিলাদের দুর্বল করে রাখা উচিত নয়। সংরক্ষণ চালু হলে শুধু নাগা মহিলারা নন, উপকৃত হবে পুরো নাগা সমাজ। কিন্তু কেউ কেউ তা মানতে রাজি নন।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাগাল্যান্ড ট্রাইবস অ্যাকশন কমিটি নির্বাচনের বিরোধী। তাদের অন্যতম দাবি মুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াংয়ের পদত্যাগ। কমিটির আহ্বায়ক কেটি ভিলাই বলেন, নাগা জনজাতিরা মেয়েদের সংরক্ষণের বিরোধী নয় কিন্তু নাগা ঐতিহ্য ও রীতিনীতির কোনো যথেচ্ছাচার তারা সহ্য করবে না। কতকটা সেই কারণেই তারা নির্বাচনে মেয়েদের সংরক্ষণের বিরোধী। বিশেষ করে সংবিধানের ২৪৩ (টি) ধারার দোহাই দিয়ে। একবার তা করা হলে নাগাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি যা সংবিধানেরই ৩৭১ (এ) ধারায় সুরক্ষিত তা লঙ্ঘিত হবে। যদিও উটসা এবং আরও কয়েকজন মহিলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন নাগা ঐতিহ্য বজায় রেখেই তারা সংরক্ষণ চান। দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই বলেই তারা মনে করেন।

ভোট হারাবার ভয়ে 'তিন তালাক' প্রথার বিরুদ্ধে বোবা হয়ে রয়েছে অ-বিজেপি দলগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ আসন্ন উত্তরপ্রদেশের একটি নির্বাচনী প্রচারের প্রাক্কালে বলেন, এই নির্বাচনে 'তিন তালাক প্রথা' বিলোপ সংক্রান্ত বিতর্ক বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। এই প্রথাকে নারী নির্যাতনের আর এক নাম আখ্যা দিয়ে প্রসাদ বলেন, এ বিষয়ে অ-বিজেপি দলগুলির সম্পূর্ণ নীরবতা শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট হারানোর আতঙ্কেরই একটি নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকা এই সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত জানতে চায়। সরকার হলফনামা দিয়ে ইতিপূর্বেই তাদের অবস্থান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে।

প্রসাদ আরও বলেন, 'তিন তালাক' কখনই কোনো ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়। এ প্রথার বিলোপ শুধু মাত্র মেয়েদের মান, মর্যাদা, ন্যায় ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭০ বছর পরেও দেশের একটি বড় অংশের নারীরা এ ধরনের অবমাননার সম্মুখীন হচ্ছেন। পিটিআই সূত্র অনুযায়ী গাজিয়াবাদে অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রসাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে জানান যে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন মিটে গেলেই সরকার এই কুপ্রথা বন্ধ করার ক্ষেত্রে বড় উদ্যোগ নিতে চলেছে। এই মর্মে প্রসাদ বলেন বিজেপিই একমাত্র দল যারা নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর। দল প্রত্যেকটি ধর্মমত ও বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষদের যথাযোগ্য সম্মান দেয় কিন্তু সেই সুযোগে কোনো কুপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে কৌশলে চালাবার প্রচেষ্টাকে তারা বাধা দেবেই।

ইতিমধ্যে ২০টি ইসলামীয় দেশের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি জানান এই দেশগুলি হয় এই প্রথা পুরোপুরি তুলে দিয়েছে নয়তো যুগোপযোগী করে এর পরিমার্জন করেছে। সেই কারণে এতগুলি দেশের লোক 'তিন তালাকের' ওপর নিয়ন্ত্রণ আনাকে যখন ইসলামি 'শরিয়া' আইনের নয় বলে মেনে নিয়েছে তখন ভারতে এই সংক্রান্ত আলোচনা করাই 'শরিয়া' বিরোধী বলে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে? বিশেষ করে ভারতের মতো একটি বিশাল ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে জারি করা বিজেপি-র অঙ্গীকার পত্রে বলা হয়েছে দল ক্ষমতায় এলে এ বিষয়ে মুসলমান মহিলাদের মতামত সংগ্রহ করে সরাসরি মহামান্য আদালতকে জমা দেবে।

এর পরই রবিশঙ্কর প্রসাদ কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব ও বিএসপি প্রধান মায়াবতীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, মেয়েদের মর্যাদা, ন্যায় ও সমান অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা 'তিন তালাক' প্রশ্নে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করুন।

তেহট্ট : রাজ্যসভায় সাংসদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইসলামিক মৌলবাদীদের ফতোয়ার কারণে এ বছর হাওড়া জেলার তেহট্ট হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পুজো করতে পারেনি। প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পুলিশ সেই শান্তিপূর্ণ অবরোধ সরাতে লাঠিচার্জ করে। তাতে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী গুরুতর আহত হয়। সম্প্রতি সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিষয়টি উত্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানদের একাংশের হিন্দুদের স্বাধীন ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করার অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'পঁয়ষট্টি বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে হওয়ার পর এ বছর তেহট্ট হাইস্কুলে সরস্বতী পুজো হলো না। আমার মনে হয় এটা খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। আমরা রাজ্যের সব মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা চাই। যাঁরা সরস্বতী পুজো করেন

স্বপন দাশগুপ্ত

তাঁদেরও এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিছু লোক সরস্বতী পুজো করতে দিচ্ছে না, কিছু লোক দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করতে দিচ্ছে না। ...এসব অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।'

স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য শুরু করা মাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নাদিমুল হক বারবার তাকে বাধা দিতে থাকেন। তার অভিযোগ, বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। তৃণমূলের সংসদীয় নেতা ডেরেক ও ব্রায়েনও গৈরিক পরিবারের একটি সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে চেঁচামেচি জুড়ে দেন। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ধেয়ে আসায় শেষপর্যন্ত নিরস্ত হন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নাদিমুল হককে সাবধান করে দিয়ে বলেন, এইভাবে চলতে থাকলে তিনি তাকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হবেন। সেই সঙ্গে, তৃণমূলের দাবি, 'বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত'— তাও তিনি খারিজ করে দিয়ে জানান দেশের মধ্যে ঘটা যে-কোনো ঘটনাই সংসদে আলোচিত হতে পারে। তিনি বলেন, 'আপনারা মনে করছেন, যেটা আপনাদের ভালো লাগবে লোকে শুধু সেই কথাই বলবে। তা হলে সংসদ চলবে কী করে? এরকম আবার হয় নাকি?'

ইসলামিক সংগঠনও তিন তালাকের বিরোধী : ল প্যানেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইসলামিক বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা তিন তালাক এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মতামত জানার জন্য ল' কমিশন যে সমীক্ষা করেছিল তাতে একাধিক ইসলামিক সংগঠন-সহ অধিকাংশ মানুষ তিন তালাকের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। সম্প্রতি ল কমিশনের চেয়ারপারসন বিএস চৌহান একথা জানিয়েছেন। আপাতত কমিশন ৪০,০০০ উত্তরদাতার অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখছে।

জাস্টিস চৌহান

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাস্টিস চৌহান জানান, অধিকাংশের মত হলো তিন তালাক এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা শরিয়তের পরিপন্থী। তালাকের আগে তিন মাসের 'ইদ্দত' বাধ্যতামূলক। কিন্তু তা না করে মেয়েদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে একতরফা তালাক দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'যদিও আমরা এখনও সকলের উত্তর পড়ে উঠতে পারিনি কিন্তু যেটুকু পড়েছি তাতে বলা যায় অধিকাংশ মানুষ, এমনকী মুসলমানদেরও একটা বিরাট অংশ তিন তালাকের প্রচলিত রূপটির বিরোধী। তাদের মতে ইদ্দতের জন্য সময় দেওয়া অবশ্যই দরকার।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিন তালাকের পাশাপাশি ল কমিশন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চেয়েছিল। যার প্রতিবাদে মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড তাদের গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। তিন তালাকের বিরোধিতা করার নামে মুসলমানদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু আশাতিরিক্ত সাড়া পেয়ে কমিশন সমীক্ষার সময়সীমা ১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। সমীক্ষার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে জাস্টিস চৌহান বলেন, 'তিন তালাকের বৈধতা বিচার করে কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি মহম্মদ মুস্তাক একটি রায় দিয়েছিলেন। পরে তা পর্যালোচনার জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই রায়ে বিচারপতি পরিষ্কার বলেছেন, ভারতে যেভাবে তিন তালাক পালিত হয় তা স্পষ্টতই কোরানে নির্দেশিত পন্থার বিরোধী। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে আমরা এ ব্যাপারে মানুষের মত নিয়েছি।' জাস্টিস চৌহান আরও জানান, শুধু তিন তালাকেই নয় মুসলমান মেয়েদের প্রতি হওয়া লিঙ্গবৈষম্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কমিশনের নজরে আছে।

তিস্তা শিতলওয়াড়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিদেশি মুদ্রা সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে তিস্তা শিতলওয়াড় এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিস্তা শিতলওয়াড় ও তার স্বামী আনন্দ শিতলওয়াড়ের সংস্থা সবরং কমিউনিকেশনস অ্যান্ড পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেডকে প্রখ্যাত বহুজাতিক ফোর্ড ফাউন্ডেশন ২,৯০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছিল। খাতায় কলমে এই অনুদানকে 'কনসাল্টেশন ফি' হিসেবে দেখানো হয়। সিবিআই-এর অভিযোগ, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আইটি-রিটার্ন পরীক্ষা করে তারা জানতে পেরেছে ফাউন্ডেশন টাকাটা অনুদান হিসেবেই দিয়েছিল, কনসাল্টেশন ফি হিসেবে নয়। তার দরুন করছাড়ের সুবিধাও তারা আমেরিকায় পেয়েছে।

সিবিআই সূত্রে আরও জানা গেছে, লেনদেনের আগে ফোর্ড ফাউন্ডেশনকে বলা হয়েছিল সবরং নানারকম লবির মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং ভারতে প্রচলিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত ধারণাগুলি যাতে আরও সুদূরপ্রসারী ও গভীর করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবে।

উবাচ

❝ পাকিস্তানের মানুষ সে দেশেই থাকতে চান নাকি ভারতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চান, গণভোট নিতে হলে এই বিষয়ে নেওয়া উচিত। ❞

জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের গণভোট করানোর দাবি প্রসঙ্গে।

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

❝ তিন তালাকের সমীক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন এখনও কিছুটা বাকি কিন্তু যেটুকু করা হয়েছে তাতে বলা যায় অধিকাংশ মানুষ এমনকী বেশ কিছু ইসলামিক সংগঠনও এই প্রথা এখন যেভাবে চলছে তার বিরোধী। তাঁদের মতে ইদ্দতের জন্য সময় দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ❞

তিন তালাকের বৈধতা সম্পর্কিত জনমত সমীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গে।

জাস্টিস বি এস চৌহান
ল' কমিশনের চেয়ারপার্সন

❝ এই আদালত মনে করছে শত্রু-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই সবদিক থেকে উপযুক্ত। ❞

কংগ্রেসের সাংসদ হুসেন দলওয়াইয়ের আবেদন প্রসঙ্গে।

জে. এস কেহর
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

❝ মা-মাটি-মানুষের সরকার পালটে হয়েছে ম্যায়-মানি- মুসলমানের সরকার। ❞

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান-তোষণ প্রসঙ্গে।

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

❝ দিদি আমরা আদর্শের দুধ খেয়ে রাজনীতি করি, ক্ষমতার মদ খেয়ে নয়। ❞

'সততার প্রতীক' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সততা প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

মোদীজী, আপনার পরাজয় নিশ্চিত

শ্রী নরেন্দ্রভাই মোদী
প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার
মোদীজী,

আপনাকে অভিনন্দন। না, এই অভিনন্দন অনেক কিছুর জন্য নয়। এটা মাত্র একটা কাজের জন্য। এর আগে নোট বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনও আপনি নিজের দলের কথা ভাবেননি। সত্যি সত্যি দেশের কালোটাকা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। না, আপনি সেই উদ্যোগে পাশ করেননি। সাধারণ মানুষ যতই আপনাকে দু-হাত তুলে সমর্থন করুক আপনি কালো-কারবার বন্ধ করতে পারেননি। রাজনৈতিক নেতারা ঠিক কালোটাকা সাদা করার কালো পথ বের করে ফেলেছে।

এবার আপনি চাইছেন রাজনৈতিক দলের অনুদান গ্রহণ নিয়ে কালোটাকার কারবার বন্ধ করতে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি যে সংস্কারের পথে হাঁটতে চেয়েছেন তা কি আদৌ সফল হবে? আপনার এই সিদ্ধান্তকে সেলাম জানিয়েও প্রশ্ন তুলছি। আপনি নিজেও রাজনীতিক। আপনারও একটা রাজনৈতিক দল রয়েছে। কিন্তু সেসব না ভেবে আপনি যে পথে হাঁটতে চাইছেন তাতে শুধু বিরোধীরা নয়, আপনার দলের অনুদান সংগ্রহও ধাক্কা খাবে। তবু আপনি সফল হবেন না। আর তার কারণ একটাই— নোট বাতিল করে দেশবাসীকে পাশে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো কিছু করেই রাজনৈতিক দলকে পাশে পাওয়া যায় না। দেশের রাজনীতি যে কালো পথে চলছে তা থেকে তুলে আনা কঠিন কাজ।

বাজেট প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলের তহবিল সংগ্রহে কালোটাকার কারবার রুখতে যে নীতি চালু করতে চেয়েছেন আপনি তাতে বলা হয়েছে— ২০০০ টাকার বেশি নগদ অনুদান বা চাঁদা নিতে পারবে না কোনো রাজনৈতিক দল। এর বেশি হলে চেক অথবা ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমেই অনুদান বা চাঁদা নিতে হবে। আর ২০০০ টাকার বেশি অনুদানদাতার নাম প্রকাশ করতে হবে রাজনৈতিক দলের হিসেবে। এখানেই না থেমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইন বদল করার কথাও বলেছেন জেটলি। তিনি বলেছেন, আরবিআই ইলেক্টোরাল বন্ড কিনতে পারবেন অনুদানদাতারা। সেই বন্ড ডিজিটাল মাধ্যমে কিনতে হবে এবং সেটা রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া যাবে। তারা ভাঙিয়ে নিতে পারবে।

এখনই অবশ্য এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না। আইন বদল করে এই নীতি কার্যকর হবে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের গোড়ায় অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১৮। সেটা অনেক দূরে কিন্তু এখনই রাজনৈতিক দলগুলি তৈরি কীভাবে কালোটাকা সাদা উপায়ে সংগ্রহ করা যায়। জেনে নিন সেই সব পথ। আর তাতেই স্পষ্ট যে, আপনি চাইলেও রাজনৈতিক দলে কালোটাকা প্রবেশ আটকাতে পারবেন না।

১। এখন ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত কেউ অনুদান দিলে তার নাম ঘোষণা করতে হয় না। এই রকম বেনামি আয়ের জন্য প্রতি ২০ হাজার টাকায় একটি রসিদ কেটে দিলেই হয়ে যায়। এখন নগদ অনুদান ২ হাজার টাকায় বেঁধে দিতে চায় কেন্দ্র। এর ফলে রাজনৈতিক দলের কোনো সমস্যাই হবে না। আগে প্রতি ২০ হাজার টাকায় একটি রসিদ কাটতে হোত, এখন প্রতি ২০ হাজারে দুই, দুই করে ১০টি রসিদ কাটলেই হয়ে যাবে।

২। রাজনৈতিক দলকে সব সময় যে টাকাতেই অনুদান নিতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি কালোটাকা দিয়ে রাজনৈতিক দলের প্রচারের খরচ মিটিয়ে দেয় তবে তা কী করে আটকাবে সরকার? কোনো রাজনৈতিক দলের গাড়িতে তেল ভরে দেওয়ার মাধ্যমে কালোটাকার কারবার কি আদৌ বন্ধ করা সম্ভব?

৩। বেশি টাকা অনুদান দিতে হলে তা অনলাইনে দিতে হবে। নতুন নীতি তৈরি করতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা আয়করে ছাড় নেওয়ার জন্য অনলাইনে টাকা দেওয়ার পরেও কালো টাকা দিতে পারবে। সেজন্য দলের এক বা একাধিক কর্মী সেই পরিমাণ টাকা নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রেখে অনলাইনে পার্টি ফান্ডে পাঠিয়ে দিতে পারবে।

৪। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বন্ড কিনে রাজনৈতিক দলকে চাঁদা বা অনুদান দেওয়া যাবে। এতেও কি আদৌ কালোটাকার ব্যবহার রোধ করা সম্ভব? ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া কালোটাকা দলের অনুগত কর্মীদের অ্যাকাউন্ট মারফত আর বি আইয়ের বন্ড হয়ে ঢুকবে দলের তহবিলে।

নতুন এই সাদা নীতি চালুর জন্য আইন আনার কথাও বলেছেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু মোদীজী, সেই আইন হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছে আইন ভাঙার পথ। যে পথে লাঠি ভাঙলেও সাপ মরবে না।

—সুন্দর মৌলিক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা নেই কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের অনুমতি সংবিধান দেয়নি

গত ৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার পঞ্জাব এবং গোয়াতে রাজ্য বিধানসভার ভোট নির্বিঘ্নে হয়েছে। উভয় রাজ্যেই ভোট পড়েছে প্রায় ৮০ শতাংশের কাছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো ভোট-সন্ত্রাসের অভিযোগ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি করেনি। তাই ধরে নিতে পারি দুই রাজ্যেই জনমতের সঠিক প্রতিফলন দেখা যাবে ১১ মার্চ ভোট গণনার ফলাফলে। নোট বাতিলের পর দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার ভোট হচ্ছে। ভোটে এবার বিজেপির রাজনৈতিক ভাগ্যের অনেকটাই নির্ভর করবে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের ভাল এবং মন্দের উপর। অর্থাৎ, কালোটাকার রমরমা যে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কড়া পদক্ষেপকে পঞ্জাব আর গোয়ার মানুষ স্বাগত জানালে দুই রাজ্যেই বিজেপির বিপুল জয় সুনিশ্চিত। উলটোদিকে, টানা তিনমাস ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষের যে ভোগান্তি হয়েছে সেই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটলে বিজেপির ভরাডুবি হবে। কারণ, কেন্দ্রের আমলাদের এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যর্থতার দায় বিজেপিকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের মুখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কেন? বিশেষ করে নোট বাতিলের প্রেক্ষিতে দেশের কালাধন কতটা উদ্ধার করা গেছে এবং কতজন কালোবাজারিকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে ইত্যাদি জরুরি তথ্য সাধারণ মানুষের অজানা থেকে গেছে। অন্তত নির্বাচনী প্রচারে নোট বাতিলের পজিটিভ দিকটি প্রচারে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি।

দেশের শাসন ক্ষমতার কেন্দ্র দিল্লির কাছেই পঞ্জাবের অবস্থান। অথচ কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব তেমনভাবে পঞ্জাবের নির্বাচনে পড়ে না। যেমন, গত ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে মোদী-ঝড়ের প্রভাব পঞ্জাবে সেভাবে দেখা যায়নি। পঞ্জাবে লোকসভার মোট ১৩টি আসনের ৬টি পায় শিরোমণি অকালি দল (৪টি) এবং বিজেপি (২টি) জোট। অন্যদিকে, কংগ্রেস (৩টি) এবং আম আদমি পার্টি (৪টি) মিলিতভাবে সাতটি আসন লাভ করে। পঞ্জাবের রাজনীতিতে নবাগত আম আদমি পার্টির চমকপ্রদ উত্থান নিঃসন্দেহে চিন্তার বিষয়। কারণ, এই দলটির তহবিলে মোটা টাকা আসে বিদেশ থেকে।

গূঢ় পুরুষের কলম

টাকার সোর্সটি অজানা। এই টাকার বখরা নিয়ে ঘরোয়া কোন্দলে দলের প্রায় সব প্রভাবশালী নেতাই এখন বিতাড়িত। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দলের সর্বেসর্বা। তাঁর অনুগামীরা প্রচার চালিয়েছিল যে জিতলে কেজরিওয়াল দিল্লির সঙ্গে পঞ্জাবেরও মুখ্যমন্ত্রী হবেন। দেশের সংবিধানে একই ব্যক্তির দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ নেই এই তথ্যটি কেজরিওয়ালের দলের লোকেদের জানা নেই। যেমন, আমাদের রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানা নেই যে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির শাসনের অনুমতি সংবিধান দেয়নি। মমতার দাবি ছিল মোদী সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি দিল্লিতে একটি জাতীয় সরকার গড়ে দিন। এটা যে রাষ্ট্রপতি করতে পারেন না দিদির নাকি জানা ছিল না। অথচ রাজনীতি করার সুবাদে দিদি ৬৯টি মূল্যবান জ্ঞানের বই লিখে ফেলেছেন। অথচ একবারের জন্য তিনি ভারতীয় সংবিধানটির পাতা খোলেননি। যে ব্যক্তি চিরকাল গভর্নমেন্টকে 'গরমেন্ট' বা সম্মানকে 'সন্মান' বলে চালিয়ে গেলেন তাঁর ৬৯টি বইয়ের চারটি ইংরেজি এবং একটি উর্দু শায়েরির বই!

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনসটিটিউটের শিক্ষক শুভময় মৈত্র সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ''খুব অবাক করার মতো বিষয় যে দিল্লির এত কাছের এক রাজ্য পঞ্জাবে বিজেপি কিছুতেই একক শক্তি হয়ে উঠতে পারছে না। গত দশ বছর তারা অকালি দলের বি-টিম থেকেই খুশি।'' অকালি-বিজেপি জোটের প্রধান সেনাপতি প্রকাশ সিংহ বাদল এ' বছর নব্বই বছরে পা দেবেন। নবতিপর এই বৃদ্ধ নেতার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের ধকল নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া টানা দশ বছরের রাজত্বে পঞ্জাবের উন্নয়নে বড় গলায় বলার মতো তেমন কিছু অকালিরা করে দেখাতে পারেননি। পঞ্জাবের লড়াইটা ত্রিমুখী। অকালি-বিজেপি জোটকে হারাতে লড়াইয়ের ময়দানে আছে কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি। শেষ দুটি দল পরস্পরের রাজনৈতিক শত্রু। কংগ্রেস এবং 'আপের' ভোট ভাগাভাগির ফলে লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারে বিজেপি জোট। সম্প্রতি চণ্ডিগড় পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি বিপুল জয় পেয়েছে। এতে দলের কর্মীদের মনোবল বেড়েছে। সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা বলছে, গোয়ার ভোটে প্রভাব ফেলবে কেজরিওয়ালের দল 'আপ'। গোয়া বিধানসভায় ৪০টি আসন আছে। লোকসভার আসন দুটি। গোয়া পূর্ণ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর থেকে এতকাল সেখানে কংগ্রেস এবং বিজেপির সরকার চলেছে। যেমন, ২০০৭ সালে গোয়ায় ছিল কংগ্রেস জোট সরকার। ২০১২ সালে চালু হয় বিজেপির জোট সরকার। এই নির্বাচনে বিজেপি একাই ৪০টি আসনের মধ্যে ২১টি দখল করে। তার জোট সঙ্গী মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি পায় ৩টি আসন। ২০১৪-র লোকসভার নির্বাচনে মোদী ঝড়ে গোয়ার ২টি আসনই যায় বিজেপির দখলে। গোয়ায় বিজেপির রাজ্য সংগঠনও যথেষ্ট মজবুত। তাই বিজেপির গোয়া পুনর্দখলের বিষয়টি এবার নিশ্চিত। কেজরিওয়ালের দল 'আপ' কংগ্রেসের ভোট কেটে তাকে ভোটের ময়দানে চিৎ করবে। 'আপ' খেলতে নামায় সুবিধাই হয়েছে বিজেপির। কারণ তার বিরোধী শক্তি বিভক্ত। ভোট কাটাকাটির অঙ্কে গোয়ায় এবার বিজেপির জয় না পাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।

হিন্দুকে তার একক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার তেহট্ট উচ্চবিদ্যালয়ে এ' বছর সরস্বতী পুজো হয়নি। বলা ভালো, পুলিশ, প্রশাসন এবং উগ্র উচ্ছৃঙ্খল ইসলামিক মৌলবাদীদের আপত্তিতে ও হামলায় এবার এই উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পুজো করতে পারল না। ৬৫ বছর পর এই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে গেল। এই উচ্চবিদ্যালয়টিতে উগ্র ইসলামিক মৌলবাদীরা নবি দিবস পালনের দাবিতে এর আগে হাঙ্গামা চালিয়েছিল। তাদের তাণ্ডবের মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামিক মৌলবাদীরা হুঙ্কার দিয়েছিল, নবি দিবস পালন করতে না দেওয়া হলে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হবে। গত ৬৫ বছর ধরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতীর আরাধনা করে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই, ইসলামিক মৌলবাদীদের এই ফতোয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানে। খুব সঙ্গত কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো করার দাবিতে ৩১ জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রায় হাজার দেড়েক অভিভাবক, স্থানীয় মানুষ এবং ছাত্রছাত্রী ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। জেলার পুলিশ সুপার, দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় এসে এই ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য না শুনে, তাদের আবেগকে মর্যাদা না দিয়ে নির্বিচারে লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এখানেও শেষ নয়। এরপর বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালানো হয়। স্থানীয় খালিসানি কালীতলা গ্রামটি পুরুষশূন্য হয়ে যায়। স্কুল চত্বরে পুজো করা যাবে না বুঝে, সরস্বতী পুজোর দিন ছাত্রছাত্রীরা একটি সরস্বতী প্রতিমা এনে বিদ্যালয়ের পাশেই একটি মাঠে পুজোর আয়োজন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানেও পুলিশ তাদের পুজো করতে দেয়নি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত এক মাস ধরে নবি দিবসের দাবি আদায়কে কেন্দ্র করে এই বিদ্যালয়ে ইসলামিক মৌলবাদীরা তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাদের তাণ্ডবে গত একমাস ধরে এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে রয়েছে। ইসলামিক হাঙ্গামাবাজদের এই তাণ্ডব বন্ধে গত একমাসে পুলিশ-প্রশাসন কোনো সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। বরং, গত একমাসই পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নির্বিকার দর্শকের। কিন্তু, সরস্বতী পুজোর ঠিক আগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলটি বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। শুধু তাই নয়, ৬৫ বছর ধরে চলে আসা বিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোটি এবারও করতে দিতে হবে— ছাত্রছাত্রীরা এই দাবি তোলায় তাদের লাঠিপেটা করা হয়েছে। এই ভূমিকা পালন করে, এতদ্বারা, পুলিশ ও প্রশাসন ইসলামিক উচ্ছৃঙ্খল মৌলবাদীদের অন্যায় দাবির কাছেই মাথা নত করেছে।

এই রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর দল সংসদে বাজেট বক্তৃতায়

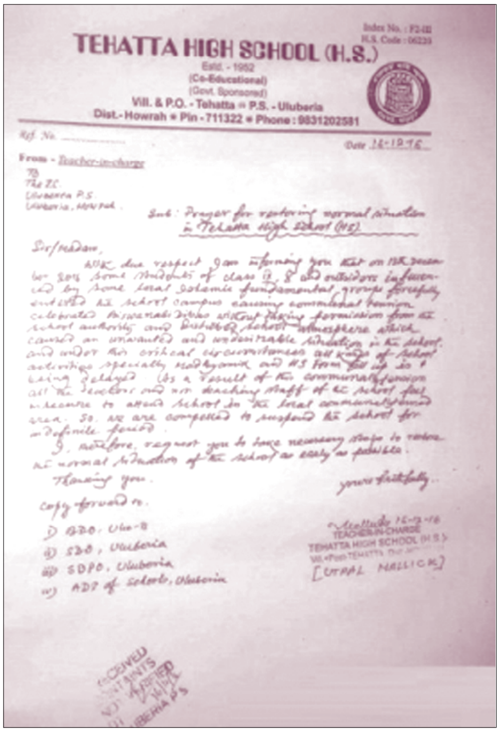
Index No. : F2-III
H.S. Code : 06239
TEHATTA HIGH SCHOOL (H.S.)
Estd. - 1952
(Co-Educational)
(Govt. Sponsored)
Vill. & P.O. - Tehatta ∗ P.S. - Uluberia
Dist.-Howrah ∗ Pin - 711322 ∗ Phone : 9831202581

Ref. No. ....
Date 16-12-16

From - Teacher-in-charge

To
The I.C.
Uluberia P.S.
Uluberia, Howrah.

Sub : Prayer for restoring normal situation in Tehatta High School (HS)

Sir/Madam,

Thanking you.

Yours faithfully

Copy forwarded to.
i) BDO, Ulu-II
ii) SDO, Uluberia
iii) SDPO, Uluberia
iv) ADI of Schools, Uluberia

TEACHER-IN-CHARGE
TEHATTA HIGH SCHOOL (H.S.)
[UTPAL MALLICK]

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি।

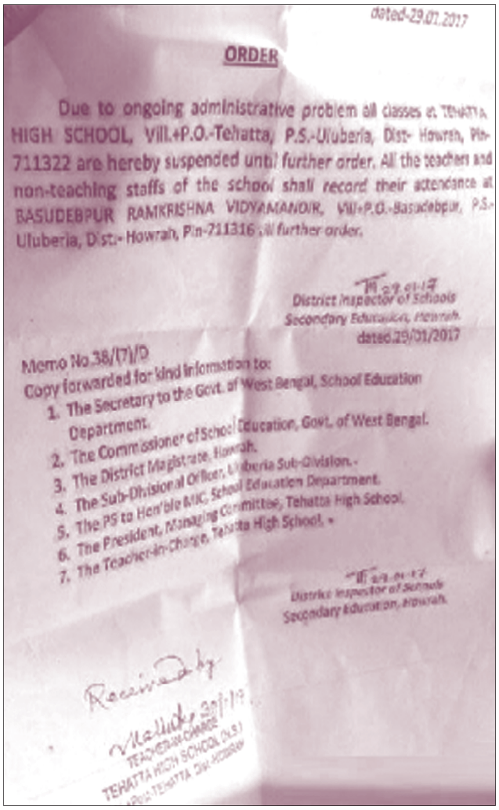
dated-29.01.2017

ORDER

Due to ongoing administrative problem all classes at TEHATTA HIGH SCHOOL, Vill.+P.O.-Tehatta, P.S.-Uluberia, Dist- Howrah, Pin-711322 are hereby suspended until further order. All the teachers and non-teaching staffs of the school shall record their attendance at BASUDEBPUR RAMKRISHNA VIDYAMANDIR, Vill+P.O.-Basudebpur, P.S.-Uluberia, Dist.- Howrah, Pin-711316 till further order.

District Inspector of Schools
Secondary Education, Howrah.
dated.29/01/2017

Memo No.38/(7)/D
Copy forwarded for kind information to:
1. The Secretary to the Govt. of West Bengal, School Education Department.
2. The Commissioner of School Education, Govt. of West Bengal.
3. The District Magistrate, Howrah.
4. The Sub-Divisional Officer, Uluberia Sub-Division.
5. The PS to Hon'ble MIC, School Education Department.
6. The President, Managing Committee, Tehatta High School.
7. The Teacher-in-Charge, Tehatta High School.

District Inspector of Schools
Secondary Education, Howrah.

Received by

স্কুল বন্ধের প্রশাসনিক নির্দেশনামার প্রতিলিপি।

অংশগ্রহণ করেনি। বাজেট বক্তৃতায় অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মাননীয়ার প্রকাশ্য যুক্তি ছিল— শ্রীপঞ্চমীর উৎসবে সারা রাজ্য মেতে থাকবে। তিনি এবং তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদরাও উৎসবের মেজাজে থাকবেন। এরকম একটি দিনে সংসদে বাজেট পেশ করাটিকে তিনি অন্যায় মনে করেন। কাজেই তাঁর দলের সাংসদরা সংসদে বাজেট বক্তৃতা বয়কট করবেন। মাননীয়া নিশ্চয়ই তাঁর পুলিশ মারফত খবর পেয়ে গিয়েছেন--- তাঁরই শাসনাধীন একটি রাজ্যের একটি বিদ্যালয়ে এবার ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী পুজো করতে দেওয়া হয়নি। শুধু করতে দেওয়া হয়নি, তাই নয়— পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করেছে। মাননীয়া জেনে গেছেন নিশ্চয়ই এই পশ্চিমবাংলারই একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এবার শ্রীপঞ্চমীর উৎসব ম্লান হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ শিরোধার্য করে তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রী- সাংসদরা সরস্বতী পুজোর দিন নানাবিধ আনন্দে মেতেছিলেন। কেউ নিজের এলাকায় পুজো মণ্ডপগুলিতে ঘুরেছেন, কেউ খিচুড়ি এবং চাটনি সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে দিবানিদ্রা দিয়েছেন (সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী)। কিন্তু এই আনন্দের দিনটিতে তাঁদের কারো একবারও মনে হয়নি এই তেহট্ট উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবার সরস্বতী পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই রাজ্যের একজন শিক্ষামন্ত্রী আছেন। তিনি আবার মন্ত্রী হওয়ার পর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। রাজ্যের একটি বিদ্যালয়ে কিছু উচ্ছৃঙ্খল মৌলবাদীর তাণ্ডবে ৬৫ বছর ধরে চলা সরস্বতীপুজো বন্ধ হয়ে গেল— এ নিয়ে এই ডক্টরেট শিক্ষামন্ত্রীর কোনো হেলদোল নেই। অবশ্য, তিন তালাক প্রথাটি যাতে চালু থাকে, তার জন্য মৌলবি-ইমামদের পাশে গিয়ে বসতে তাঁর তৎপরতার কোনো অভাব দেখা দেয়নি।

নেহরুপন্থী সেকুলারবাদী এবং বামপন্থীদের ভিতর একটি কথা ইদানীং খুব চালু হয়েছে। কথাটি হচ্ছে 'গৈরিকীকরণ'। সর্বত্রই এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারটি বিদায় নেওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন, প্রতিটি বিষয়ে এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখতে শুরু করেছে। সরস্বতী বন্দনায় এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখে, ভারতমাতা কী জয় ধ্বনিতে এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণে এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখে, ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এরা গৈরিকীকরণের ভূত দেখে। এরা মনে করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সারাদেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করছে। নেহরুপন্থী সেকুলাবাদী এবং বামপন্থীরা, আশা করা যায়, তেহট্ট উচ্চবিদ্যালয়ের ঘটনাটি শুনেছে। তার আগে ধুলাগড় প্রভৃতিস্থানের ঘটনাগুলিও তারা শুনেছে— এমন আশা করাই যায়। কারণ, এই ঘটনাগুলি বহুল প্রচারিত এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। অন্য সব ঘটনাও যদি ছেড়ে দিই, তেহট্ট উচ্চবিদ্যালয়ের ঘটনায় নেহরুবাদী এবং বামপন্থী সেকুলারবাদীরা কি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাত দেখছেন? তাদের কি মনে হচ্ছে না, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো মানুষের ধর্মাচরণের অধিকার কেড়ে নেওয়া জঘন্যতম অপরাধ? আর এই অপরাধটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে, উচ্ছৃঙ্খল ইসলামিক মৌলবাদীরা এবং পুলিশ-প্রশাসন। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইদানীং সভা-সমিতিতে বলতে শুরু করেছেন— তাঁর রাজ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে চান। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে যারা প্ররোচনা জোগাচ্ছে, ইন্ধন জোগাচ্ছে— তাদের তিনি রেয়াত করবেন না। ভালো কথা, খুব ভালো কথা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হোক— এটা কোনো মূর্খই চায় না। কিন্তু তেহট্টের ঘটনায় যে ইসলামিক উগ্রবাদীরা প্রথম থেকেই তাণ্ডব করতে মাঠে নেমেছে, যাদের হুমকিতে ওই উচ্চবিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে যায়— তাদের দমন করতে কী ব্যবস্থা নিলেন মুখ্যমন্ত্রী? কালিয়াচক থেকে ধুলাগড়, দেগঙ্গা থেকে ক্যানিং--- যারা নিরপরাধ হিন্দু পরিবারগুলির ওপর হামলা চালিয়েছে— কী ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী? না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করায় উদ্‌গ্রীব মুখ্যমন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেননি। বরং, এইসব এলাকাতেই অত্যাচারিত হিন্দু পরিবারগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে, ধরপাকড় করে তাদের আরও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছে এই রাজ্যেরই পুলিশ।

এই ঘটনাগুলি আমরা জানি। আরও কী কী ঘটতে পারে ভবিষ্যতে তাও আমরা জানি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে অর্পণ করে দেওয়ার একটি সুগভীর চক্রান্ত যে শুরু হয়েছে— তাও আমরা জানি। এই চক্রান্তের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবেই হিন্দুদের ওপর হামলা যে শুধু শুরু হয়েছে তাই নয়, বেশ কিছু এলাকায় হিন্দুদের ধর্মাচরণের ওপরও আঘাত আসছে। এমতাবস্থায় হিন্দুদের কর্তব্য হিন্দুদের নিজেদেরই নির্ধারণ করতে হবে। আগামী দিনগুলিতেও অনেক আঘাত আসবে— এবং সেইসব আঘাতের দিনগুলিতেও পুলিশ-প্রশাসনের কোনোরকম সহযোগিতা বা সহানুভূতি পাওয়া যাবে না— এই নির্মম সত্যটিকে মেনে নিতেই হবে। ভবিষ্যতেও ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সেকুলারবাদী নেহরুপন্থী-বামপন্থীরাও টু শব্দটি করবে না---এটিই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁদের রাজনীতিটিই মুসলমান তোষণের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, হিন্দুকে ধরে নিতে হবে এ লড়াইটা তাঁর নিজস্ব, তাঁর একার। আর এই লড়াইয়ের জন্য তাঁকে আত্মবলে বলীয়ান হতে হবে। এই আত্মবলে বলীয়ান হওয়ার জন্য হিন্দুকে তার সমাজ অভ্যন্তরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এক হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান-সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায়নি— এক ঈশ্বরের নামে আল্লাহো আকবর বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব হিন্দু এসো, তখন কে আসবে? আমাদের

মধ্যে কত ছোট ছোট সম্প্রদায়, কত গণ্ডি, কত প্রাদেশিকতা— এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে? কত বিপদ গিয়েছে— কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।' (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩) হিন্দুকে আত্মবলে বলীয়ান হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দও। বলেছিলেন— 'হিন্দু' তুমি আজ বিদ্যা বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য— সব কিছুতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কেন দুষ্টদুর্বৃত্তের অত্যাচার নিবারণে সাহসী হইতেছ না? কেন তুমি তোমার মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতেছ না? এমনিভাবে অসহায়ের মত নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কেন তুমি লাঞ্ছিত নিপীড়িত হইতেছ? আজ ধর্মান্দোলনের ভিতর দিয়া হিন্দুসমাজের সমস্ত ভেদবিবাদ, অনৈক্য পার্থক্য দূর করিয়া দেওয়া হইতেছে, মিলন মন্দিরের মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজের ভিতর ঐক্য, সখ্য, প্রেম, প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব আনয়ন করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে এমন এক সংযোগ-সূত্রে গ্রথিত করা হইতেছে যাহাতে একজন হিন্দুর শরীরে কোনো আঘাত আসিলে সেই বেদনা বাংলার সমগ্র হিন্দু অধিবাসী অনুভব করিতে পারে। সুতরাং তুমি নির্ভীক হও, পৌরুষ অবলম্বন কর, আর নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিও না। আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, আত্মবিশ্বাসবশে বলীয়ান হইয়া স্বীয় মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হও। তবেই তোমার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর হইবে।' (হিন্দু-সমাজ-সমন্বয়--- শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণী)

যারা আজ হিন্দু সমাজকে আত্মবলে বলীয়ান হওয়ার বদলে তোষণের রাজনীতির পথে ঠেলে দিতে চাইছেন, তাদের সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে তবে হিন্দু সমাজকে। এই তোষণবাদীদের সমালোচনা করে বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন---

উপরে : প্রধান শিক্ষকের উদ্দেশ্যে মৌলবাদীদের হুমকি। (নীচে) প্রশাসনের নির্দেশে স্কুলের প্রধান ফটকে তালা।

'কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের নীতি হলো সহনশীলতা এবং রাজনৈতিক ও অন্য সুবিধাদান দ্বারা মুসলমান তোষণ।... আমার মনে হয় কংগ্রেস দুটো জিনিস বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, তোষণ ও নিষ্পত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যর্থতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোষণের অর্থ হল, যেসব আক্রমণকারী নির্দোষ ও নিরীহ মানুষদের ওপর খুন, ধর্ষণ, লুঠ এবং অগ্নিসংযোগের মতো কার্যকলাপে অভ্যস্ত তাদের দোষ উপেক্ষা করে উৎকোচ দিয়ে বশে রাখা। অপরপক্ষে নিষ্পত্তির অর্থ হলো একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া যা কোনো পক্ষই অতিক্রম করতে পারবে না। তোষণ আক্রমণকারীর দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো সীমারেখা স্থাপন করে না। নিষ্পত্তি তা করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই কথাটি বুঝতে অসমর্থ যে সুবিধাদানের নীতি মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যা সবচেয়ে খারাপ তা হলো, মুসলমানরা এইসব সুবিধাদানকে হিন্দুদের পরাজয় বরণের মানসিকতা এবং বাধা দেওয়ার শক্তির অভাব বলে ব্যাখ্যা করে।' আম্বেদকর এই কথাগুলি বলেছিলেন স্বাধীনতার অব্যবহতি পর পরই। কথাগুলি যে কত যুক্তি এবং বাস্তবসম্মত— তা বোঝা যায়, তেহট্ট, ধুলাগড়, কালিয়াচকের ঘটনায় ও ইমাম বরকতির ফতোয়া জারিতে।

ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে তাই অন্য কারো মুখপেক্ষী না হয়ে থেকে, অন্য কারো সাহায্য বা সমর্থন প্রত্যাশী না হয়ে হিন্দু সমাজকে একক শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মবলীয়ান হয়ে লড়তে নামতে হবে। একজন হিন্দুর শরীরে কোনো আঘাত লাগলে যখন বাংলার সমগ্র হিন্দু জাতি তা অনুভব করতে পারবে— সেইদিনই মৌলবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর লড়াই জয়ী হবে। তার আগে নয়। ■

শেখর সেনগুপ্ত

বহু বছর বাদে এমন এক বাতাবরণের মধ্যে এবারের বাজেট- প্রস্তাব সংসদে পেশ করা হলো, যাকে অ-সচরাচর অবশ্যই বলা চলে। বিরোধীদের হট্টরোলের প্রারম্ভিক পর্যায় পেরিয়ে বিত্তমন্ত্রী জেটলির প্রতিটি উচ্চারণে কান পেতেছি নিবিষ্টতা নিয়ে এবং পরিশেষে আপন দৃষ্টিভঙ্গীকে পূর্ণতা দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নে ব্রতী হলাম। বাজেট যাতে পেশ না করা যায়, তার জন্য বিরোধীদের একাংশ চেষ্টার কসুর করেননি। তাঁদের যুক্তি, পাঁচ-পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনী যুদ্ধ যখন অদূরে, তখন ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের বাজেট-প্রস্তাব বিরোধীদের জয়ী হবার সম্ভাবনাকে আরও বিবর্ণ করে দিতে পারে। সেই আতঙ্কে তাঁরা সর্বোচ্চ আদালত অবধি ছুটে যান। ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় তাঁদের হতাশা স্বাভাবিক। গুটিকয়েক বিষণ্ণ হামদামুখো নজর এড়াতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত জনাকয়েককে মনে হয়েছিল তাঁদেরও কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে; ফলে যা কিছু তিক্ত কথাবার্তা, সবই সেই নোট-বাতিলের বিরুদ্ধে নিজ নিজ শিরশিরে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

এ বাজেট আমার আপনার সকলের

অবশেষে বাজেট-প্রস্তাব পেশ করলেন কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী। সেই সঙ্গে গোচরে এল রেলবাজেটও। আমার প্রতিক্রিয়া সোজাসাপটা— এই বাজেট কম-বেশি আমার আপনার সকলের। অভিভূত হইনি। কিন্তু আনন্দ ও স্বস্তির অনুভব অনস্বীকার্য।

মনে রাখতে হবে, ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের বাজেট ৯২ বছরের প্রথাকে ভাঙল। সেই ১৯২৫ সালে শেষবারের মতো সাধারণ বাজেট ও রেলবাজেট এক সঙ্গে রচিত হয়েছিল। তারপর নয়টি দশকের ওপর সময় পেরিয়ে গেল। একবারও রেলবাজেটের সঙ্গে সাধারণ বাজেটের মেলবন্ধন ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেননি। এবার করলেন।

বিরোধীদের আক্রমণ ও সমালোচনা যে মুখ্যত একমাত্রিক হবে, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সমালোচনার শর ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক ও সাহসিক বিমুদ্রাকরণের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করতে এসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সূচনাতেই অনেকখানি নির্বিষ করে দিলেন বিরোধীদের প্রধান আয়ুধটিকে। বিমুদ্রাকরণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যখন আমাদের রাষ্ট্রপতি, তখন কয়েকজন বাঘা সমালোচকের তমসাচ্ছন্ন মুখাবয়ব নজর এড়ায়নি। বাজেট পেশের আগে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালিয়েছে, তাতে একটা প্রয়াস লক্ষণীয়— এই সরকার দেশের তাবৎ গরিবদের জন্য একটা ন্যূনতম উপার্জনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্বীকৃত তথ্য যে বিমুদ্রাকরণের অভিঘাতে দেশে যেমন দুর্নীতিগ্রস্ত ও চালবাজরা অনেকাংশে কাহিল ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তেমনি দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারে কিঞ্চিৎ দুর্বলতাও পরিষ্কার প্রতিভাত— বৃদ্ধির হার থাকতে পারে ৬.৭৫ থেকে ৭.৫-এর মধ্যে। নোট বাতিলের মতো বিশাল ঘটনার পর এটা স্বাভাবিক এবং আমি দৃঢ়বিশ্বাসী যে এই দুর্বলতা নিতান্ত সাময়িক। রাজনীতি নিরপেক্ষ বিশ্লেষক হয়েও কবুল করছি, জেটলির প্রস্তাবিত এই বাজেট যথেষ্ট স্বচ্ছ ও দিশাদায়ক। বাজেট পেশ করা হয়েছে এমন একটা সময়ে, যখন কতগুলি কঠিন

প্রতিবন্ধকতা এই সরকারের সামনে রয়েছে— যা নেতিবাচক বাতাবরণ তৈরি করতে পারে ভারতের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশেও। মিছিল করে আসা প্রতিকূলতার মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে ঊর্ধ্বলম্ফন, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারে বৃদ্ধি ও আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়নের বিপরীতে সংরক্ষণ প্রবণতার ক্রমবর্ধমান দাবি। এইগুলিকে পাশ না কাটিয়ে আমাদের বিত্তমন্ত্রী সাহসের সঙ্গে তাঁর নীতিনিষ্ঠ বাজেট-প্রস্তাবে প্রশংসনীয় ভারসাম্য আনতে সমর্থ হয়েছেন। বাজারের খবরাখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, কম্পিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তি সমেত সমস্ত ধরনের শিল্পে এখন আর নতুন করে বেসরকারি বিনিয়োগ বিশেষ আসছে না। সেই শূন্যতাকে দূর করবে নতুন বাজেট মোতাবেক দেশজোড়া পরিকাঠামোতে বিপুল বিনিয়োগ। এতে পরোক্ষভাবে দেশে কর্মসংস্থানের পরিধিও বাড়বে। জেটলির বাজেট-ভাষণে নিজস্ব হিতোপদেশ নেই, আছে গান্ধীজী প্রমুখ কয়েকজন প্রবাদপুরুষের বিখ্যাত উক্তি। যেন ওই উক্তিগুলির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই আর্থিক সততা ও স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাহসী বিজেপি সরকারের বিমুদ্রাকরণই যে অদুর ভবিষ্যতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও দেশের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির মুখ্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে, জেটলি তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন তাঁর বাজেট প্রস্তাবে। প্রস্তাবিত পন্থাগুলি যখন চালু হয়ে যাবে, তখনই প্রমাণিত হবে বিত্তমন্ত্রীর উদ্ভাবনী শক্তিও কতটা প্রখর। বেকারিত্বের বোঝা কমাতে আমরা অনেকেই উলটোপালটাভাবে হরেক কিসিমের উপায় বাতলে থাকি সুযোগ পেলেই। জেটলি বললেন, বেকারিত্বের মেঘ কাটাবার সবচেয়ে বড় উপায় রয়েছে নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্যে। প্রশিক্ষিত যুব-শক্তির কখনও কর্মের অভাব ঘটে না— স্বদেশে কিংবা বিদেশে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতের বিজেপি সরকার অঙ্গীকার নিচ্ছে ১০০টি 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টার' স্থাপন করবার। অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে সমুন্নত ও বিস্তৃত করতে। জেলাস্তরের হাসপাতালগুলিতে ডিএনবি কোর্স পড়ানো হবে। ই এস আই ও পুরসভার হাসপাতালে এমডি, এম এস পাঠ গ্রহণের পরিকাঠামো গড়া হবে। তবে এই ব্যাপারগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারেরও উদ্যম থাকা চাই। বিত্তমন্ত্রী আরও যে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসম্পর্কিত শপথগুলি উচ্চারণ করলেন, সেগুলি এই রকম :

* ২০১৭ সালের মধ্যে দেশকে কালাজ্বরমুক্ত করা হবে।

* ২০১৮ সময়সীমার মধ্যে দেশ হবে কুষ্ঠমুক্ত।

* ২০২০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নির্মূল হবে হাম ও বসন্ত।

* ২০২৫ সালের পর দেশে কোনো টিবি রোগীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শিক্ষার দুনিয়ার মধ্যে ভারত যেন এক বিশেষ সম্মানের জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি সুনিশ্চিত করা হবে :

* স্কুলশিক্ষার মানকে মূল্যায়ন করবার উন্নত প্রক্রিয়া।

* উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রস্থাপন।

* দেশে ট্যুরিজম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে মান্যতা দান।

* ইউজিসিকে সংস্কারের মাধ্যমে উন্নততর করা।

* শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহকে জাগ্রত করা।

* এমডি-এমএস-এ পাঠগ্রহণের হার বাড়াতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আরও হাজার পাঁচেক।

* ডাক্তারি পড়বার যোগ্যতা নির্ণায়ক প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে সর্বভারতীয়, রাজ্যভিত্তিক নয়।

এই প্রস্তাবিত বাজেটের মূলশক্তি কিন্তু এর আদর্শ। আদর্শ হলো দেশব্যাপী ভয়াবহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াই। নোট বাতিলের মধ্য দিয়ে যে লড়াই শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তারই বাস্তবায়নকে দৃঢ়তর করবে এই প্রস্তাবিত বাজেট। এদেশে কারা কর ফাঁকি দেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তা বিলক্ষণ জানে। অরুণ জেটলি এতদিনে সেই লোকগুলিকে অন্ধকার থেকে টেনে এনে আলোর সামনে দাঁড় করাতে চাইলেন। নোটবাতিলের গুঁতোয় ইতিমধ্যে আয়কর আদায়ে বৃদ্ধি ঘটছে ৩৫ শতাংশ। ডিজিটাল লেনদেন যত বাড়বে, ততই কাবু হতে থাকবে ওই সমস্ত মুখোশধারীরা। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিতে যত টাকাই চাঁদা দেওয়া হোক না কেন, আয়কর আইনে সবটাই করমুক্ত। এবার বলা হলো, আগামী আর্থিক বছরে ২ হাজারের বেশি টাকা ঢালা

সারণি			
করযোগ্য উপার্জন	বর্তমান আর্থিক বছরে প্রদেয় আয়কর	২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে যত আয়কর দিতে হবে	সাশ্রয়ের পরিমাণ
৩ লক্ষ টাকা	৩ হাজার ৯০ টাকা	শূন্য	৩ হাজার ৯০ টাকা
৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৮ হাজার ২ শত ৪০ টাকা	২ হাজার ৫ শত ৭৫ টাকা	৫ হাজার ৬ শত ৬৫ টাকা
৫ লক্ষ টাকা	২৩ হাজার ৬ শত ৯০ টাকা	১২ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা	১০ হাজার ৮ শত ১৫ টাকা
১০ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা	১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা	১২ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা
২০ লক্ষ টাকা	৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা	৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা	১২ হাজার ৮ শত ৭৫ টাকা
৬০ লক্ষ টাকা	১৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা	১৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত ৬৩ টাকা	সাশ্রয়ের পরিবর্তে বেশি ট্যাক্স গুণতে হচ্ছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২১৩ টাকা

যাবে না নগদে; এর বেশি দিতে হলে ব্যবহার করতে হবে চেক অথবা ডিজিটাল মাধ্যমকে। অর্থাৎ দাতার পরিচিতি এবং প্রকৃত দানের পরিমাণটা এসে যাবে আয়কর দপ্তরের গোচরে। এই ব্যবস্থায় কতজন 'বিশিষ্ট' ব্যক্তির যে গোঁসা হলো, তা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই জানেন। এই রকম একটা নিয়ম এই দেশে কয়েক যুগ আগেই চালু হওয়া উচিত ছিল। যে দেশে একজন তস্য-তস্য ছোট মাপের রাজনৈতিক নেতারও যেরকম কোটিপতিতুল্য জীবনযাত্রা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি, সেখানে এই নজরদারি যত ধারালো হয়, ততই জনগণের মঙ্গল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে শেষমেশ সেই নোটবাতিলকে নিয়েই খানিক বিষোদ্গার করলেন। কিন্তু একথা তো সত্যি যে মানুষের হয়রানি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। আসল দুঃখ ও হয়রানি যে কাদের, তা উপলব্ধি করতে পারছি আমরা সাধারণ ছাপোষা মানুষরা। নগদ-লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা হওয়ায় আমাদের বিমর্ষ হবার কোনো কারণ ঘটেনি। পরিবহণে বরাদ্দ ৫৫ হাজার কোটি টাকা হওয়ায় আমরা আশা করছি, অতঃপর যাত্রীসুরক্ষায় ও সুবিধাদানে রেল অধিকতর দায়িত্বশীল হবে। যাত্রী ভাড়ায় বৃদ্ধি ঘটেনি। আমরা খুশি, তবে কিছু বৃদ্ধি ঘটলে আমরা তাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতাম। আর্থিক বৃদ্ধির হার যদি ৭.৫ শতাংশ ধরে রাখতে পারে সরকার, স্যালুট করবো। মূলধনী ব্যয় যে ২৫.৪ শতাংশ বাড়ল, তাতে ঢোক গিলবো না, যদি মূল্যবৃদ্ধির হারকে সত্যি সত্যি ৬-৭ শতাংশের মধ্যে বেঁধে রাখা যায়। সবচেয়ে উৎসাহ বোধ করবেন আমাদের কৃষকভাইরা। পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের আয় দ্বিগুণ হবে— এতটাই প্রত্যয়ী বিত্তমন্ত্রী। তবে আমরা যারা সুদ-নির্ভর প্রবীণ নাগরিক, এই সরকারের কাছ থেকে আরও একটু বেশি উদারতা চাইছি। অবশ্য ৮ শতাংশ সুদে ১০ বছরের পেনশন যোজনা মন্দের ভালো। প্রতি তিন মাসে নয়, প্রতি মাসে সুদ দানের ব্যবস্থা একান্ত কাম্য। প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে এর শামিল করা উচিত। স্বাস্থ্য-পরিষেবায় আধার-ভিত্তিক কার্ডকে সিনিয়র সিটিজেনরা স্বাগত জানাচ্ছেন। কিন্তু খাদ্যে ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হবে, তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ। অর্থনীতিতে ভরতুকি একটা ব্যাধি— যার প্রকোপ যত কমবে, তত মঙ্গল। তাই জ্বালানিতে ভরতুকি কমছে জেনে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। বাজেটে খুশির হাওয়া— যা ঝাপটা মারলো শেয়ার বাজারেও। একলপ্তে ৪৮৬ পয়েন্টের বৃদ্ধি সেনসেক্সে। সেই সুবাদে টাকার দামও বেড়ে গেল ৪০ পয়সা। অর্থাৎ পরিস্থিতি ইতিবাচক। ফিরিস্তির সাত-সতেরো দিয়ে এ লেখাকে অতিকায় করবার সামান্যতম বাসনাও আমার নেই। তবে যেহেতু আমি এক সামান্য মধ্যবিত্তের মানুষ, এই ডিজিটাল যুগের প্রথম বাজেটটিকে চর্চায় এনে আমার মধ্যে পুলকের চেয়ে স্বস্তির আবহটাই বেশি। যেহেতু ২০০২ সনে একটি বৃহৎব্যাঙ্কের পদস্থ আধিকারিকরূপে অবসর গ্রহণ করি, বিচিত্র নিয়মের বেড়াজালে ওই সময়ের অন্য সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের ন্যায় আমার পেনশনও আয়করের আওতায় আসে না। তবুও যাঁদের আসছে, তাঁদের প্রসন্ন বদন প্রত্যক্ষ করে স্বস্তি পাচ্ছি। এক কথায় এই বাজেট আয়করের হারে যে পরিবর্তন এনেছে, তাকে বিত্তবানদের দীর্ঘশ্বাস শ্রুত হলেও মধ্যবিত্তের প্রশান্তি অনস্বীকার্য। আমি সারণিতে প্রস্তাবিত আয়করের হার তুলে ধরলাম 'স্বস্তিকা'র বিপুল সংখ্যক পাঠকদের অবগতির জন্য। হিসেবটি পেয়েছি বাংলায় এক বিখ্যাত ও 'জনপ্রিয়' পত্রিকার পাতায় :

সংক্ষিপ্ত সারণিই প্রমাণ করে যে এই বাজেট মধ্যবিত্তদের মুখে হাসি ফোটালেও বিত্তবানদের মুখে বিরক্তির রেখাগুলিকে গভীরতর করবেই। যাদের হাতে অপরিমিত সম্পদ, তাবৎ উল্লাস ও হুঙ্কারের উৎস হলো কালোটাকা, তাঁরা এই বাজেটের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠবেনই। বাজেটে পরিষেবা কর থাকছে পূর্ববৎ। তাই মধ্যবিত্তরা নিশ্চিন্ত। তবে নিশ্চিন্ত নাও থাকতে পারে নিকটবর্তী সময়ে। কারণ আগামী ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে বলবৎ হতে হলেছে পণ্য পরিষেবা কর (জি এস টি)। তখন পরিষেবা করের হারে যদি ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, মধ্যবিত্তের স্বস্তি কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।

(লেখক একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ)

কেন্দ্রীয় বাজেট অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে

অম্লানকুসুম ঘোষ

অপেক্ষার প্রহর গোনা অবশেষে শেষ। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হলো ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-য়। ভারতের মতো বিকাশশীল এবং সংখ্যাবহুল দেশের বাজেট প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক মহলে প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু এবারে অর্থনীতিক মহলের বাজেট নিয়ে কৌতূহল অনেক বেশি ছিল। শুধুমাত্র রেল বাজেটকে মূল বাজেটের সঙ্গে মিশিয়ে এক অভিন্ন বাজেট পেশ করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্যই নয়, এবারের বাজেট অতিরিক্ত কৌতুহলোদ্দীপক আরও নানা কারণে। বিমুদ্রাকরণের পরে বাজেট পেশ করে সরকার কীভাবে বিমুদ্রাকরণের সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দেন এবং দেশবাসীকে বিমুদ্রাকরণের সুফল কীভাবে পৌঁছে দেন তা লক্ষ্য করার জন্যও সাদর আগ্রহে বাজেটের দিকে তাকিয়ে ছিল দেশবাসী। বাজেট কি দেশবাসীর সেই প্রত্যাশা পূরণে সফল হলো? নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা যাক।

এবারের বাজেটকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের নিরিখে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ। দ্বিতীয়ত, হ্রস্বমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ। বিশ্লেষণে দেখা যাক, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয়। এবারের বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের জন্য তিন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা স্বাধীনতার পর এযাবৎকাল পেশ হওয়া সমস্ত বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ফলে দেশের পরিকাঠামো (যার মধ্যে রেল, সড়ক, বিমান, জাহাজ প্রভৃতি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা। ভারত নেট-এর মতো ফাইবার অপটিক্স নির্ভর তথ্য পরিবহণ ব্যবস্থা এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিকাঠামো তৈরির মতো অত্যাবশ্যকীয় অর্থনৈতিক পশ্চাদপট নির্মাণ সবই বর্তমান) উন্নত হবে, বিকাশশীল অর্থনীতির দেশের পক্ষে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে ভারতে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির যতরকম অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি রয়েছে, সবকটি পদ্ধতিতেই অর্থনীতির বিকাশে পরিকাঠামোর উন্নতি অবশ্য স্বীকৃত একটি বিষয়। প্রশ্ন এতদিন ছিল এই বিপুল পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান হবে কোথা থেকে? নোট বাতিল পরবর্তী বাজেটে অর্থের সে অভাব মিটেছে, শুরু হয়েছে অর্থনীতির নবযুগের দিকে যাত্রা। কিন্তু পরিকাঠামোর উন্নতি অর্থনীতির বিকাশের আদর্শ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে, হয়তো বিদেশি বিনিয়োগও টেনে আনতে পারে। কিন্তু দেশীয় বিনিয়োগ না বাড়ালে জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির লাভের গুড় তো খেয়ে যাবে বিনিয়োগকারী বিদেশি পিপড়াই। তাই দেশীয় বিনিয়োগ যাতে বাড়ে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট মোদী সরকার এবং কাজেও সরকারকে এবং বাজেটকে সাহায্য করেছে বিমুদ্রাকরণ নীতি। বিমুদ্রাকরণের ফলে ব্যাঙ্কগুলির সঞ্চয়খাতে এখন অনেক টাকা। এই সঞ্চিত অর্থ ঋণ হিসেবে দিতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতাদের বেশি করে আকর্ষিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি ঋণের সুদ কমানো শুরু করেছে এবং অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী ভবিষ্যতে ক্রমাগত কমাবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিনিয়োগকারীর পক্ষে বিনিয়োগ করা এখন অনেক সহজ হলো। ফলস্বরূপ দেশীয় বিনিয়োগ অর্থাৎ সাধারণ দেশবাসীর সঞ্চিত অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়ে ভারতীয় উদ্যমী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বাড়বে। তাতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লভ্যাংশ ভারতীয়দেরই হস্তগত হবে যা দেশীয় অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এবং অবসান ঘটবে

> **শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই কোনো বাজেটের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বলে গৃহীত হয় না, বরং অর্থনীতির চিরকালীন ভিত্তি মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং তার রক্ষণ বাজেটের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বাজেট সে ব্যাপারেও পথিকৃৎ।**

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আমল থেকে চলে আসা এক হতাশার যে ভারতীয়রা শুধুই চিনির বলদ, চিনির স্বাদক নয়।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে কিন্তু দুর্নীতি দূর করতে না পারলে সেই সমৃদ্ধি ন্যায্যভাবে বণ্টিত হবে না দেশবাসীর মধ্যে। সেই দুর্নীতি বিশাল ঘা খেয়েছে বিমুদ্রাকরণের ফলে। ভবিষ্যতেও যাতে এই দুর্নীতি মাথাচাড়া না দেয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবারের বাজেটে। কালোটাকার প্রধান সৃষ্টিকর্তা বেআইনি নগদ লেনদেনকেই আঘাত করা হয়েছে। তিন লক্ষাধিক টাকার লেনদেন এরপর থেকে নগদে করা নিষিদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির ভূতুড়ে ভাণ্ডারকে আয়কর বিভাগের নজরবন্দি করার জন্য রাজনৈতিক দলকে নগদে দু' হাজার টাকার বেশি চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়ন, দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দুর্নীতি দূরীকরণ, অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত। এরপর নির্দিষ্ট লক্ষভিত্তিক সরকারি পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনারও বিচক্ষণ নিদর্শন দেখা গেছে এই বাজেটে। আগামী পাঁচ বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের বাজেটে কৃষকদের জন্য থাকতো কিছু ঋণ ছাড়ের ঘোষণা। যার প্রভাব দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর পড়ত না। কিন্তু সুযোগসন্ধানী কৃষক যারা নিজেদের ঋণ অনাদায়ী রাখত তারা লাভবান হোত। এই প্রথম দেশের কৃষি উৎপাদন তথা কৃষকসমাজের বার্ষিক আয় মাত্র পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করার মতো মৌলিক পরিকল্পনা নিয়েছে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার।

কৃষক সমাজ এবং কৃষিক্ষেত্রের দিকে নজর দিতে গিয়ে অর্থনীতির অন্য ক্ষেত্রগুলিকে অবহেলা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেটে। শিল্পের উন্নতির জন্য মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ করছাড় ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঋণে সুদ কম হবার জন্য উপরিউক্ত কারণে শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে তার সুফলও শ্রমিকসমাজ পাবে একথা বলাই যায়।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই কোনো বাজেটের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বলে গৃহীত হয় না, বরং অর্থনীতির চিরকালীন ভিত্তি মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং তার রক্ষণ বাজেটের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বাজেট সে ব্যাপারেও পথিকৃৎ। গত দু' বছরের বাজেটে মোদী সরকার তারুণ্যের জয়গান গেয়ে অর্থাৎ দেশের নব প্রজন্মের বিকাশসাধনের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাই এবারে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আধার কার্ড নির্ভর চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাওয়া এবার থেকে বন্ধ হবে আশা করা যায়।

এবার আসা যাক বাজেটের হ্রস্বমেয়াদি লক্ষ্যের ব্যাপারে। দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীকে দু' হাত ভরে উপহার দিয়েছে এবারের বাজেট। ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ দশ শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হয়েছে এবং আয়কর ছাড়ের পরিমাণ ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের ফলে আয়করের বাইরে থাকা বিপুল পরিমাণ সম্পদকে আয়করের এবং জরিমানার আওতায় আনার পর সৎ আয়করদাতাদের ছাড় দেওয়ার যে প্রত্যাশা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তা পূরণ করা হয়েছে বাজেটে এভাবেই। বিমুদ্রাকরণের জন্য হওয়া সাময়িক অসুবিধা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করে নেওয়ার জন্য জনসাধারণকে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পুরস্কার হিসেবেও গণ্য হতে পারে। এছাড়াও ছাড় দেওয়া হয়েছে কমদামি আবাসন প্রকল্পের করব্যবস্থায়। এই ঘোষণাও দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্তের ভীষণ সহায়ক হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নানাবিধ যোজনা তো আছেই। সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংস্থানে কেন্দ্রীয় বাজেট এভাবেই তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তগুলির সুফল কিন্তু শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রত্যক্ষভাবে স্বল্পমেয়াদি হলেও পরোক্ষভাবে এগুলির দীর্ঘমেয়াদি বড় প্রভাব অর্থনীতিতে পড়বে। কীভাবে? দেখা যাক। স্বল্পমূল্যের আবাসন প্রকল্পে কর ছাড় দেওয়ায় এই ধরনের আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে জোগান অর্থাৎ আবাসনের নির্মাণও বাড়বে অর্থাৎ কর্মসংস্থান ও অর্থের জোগান বাড়বে। এবং এই কর্মসংস্থানগুলি হবে মূলত শ্রমজীবী শ্রেণীর অর্থাৎ অর্থনীতির একেবারে তলার অংশে অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে যা চাহিদা সৃষ্টি করবে। ফলে সেই চাহিদা পুরণের জন্য জোগান বাড়বে। অর্থাৎ উৎপাদন বাড়বে যা নতুন করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে অর্থাৎ পুনরায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফলস্বরূপ অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে চাহিদা বৃদ্ধি ও পুনরায় উৎপাদন-বৃদ্ধি। এভাবে জাতীয় অর্থনীতি সেই বৃদ্ধিচক্রের মধ্যে প্রবেশ করবে যেখানে পুনঃপুনঃ ক্রয়ক্ষমতা, চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্বয়ং গতিপ্রাপ্ত হবে। আয়করে ছাড় দেওয়ার ফলেও এভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে নানাক্ষেত্রে। সেই চাহিদা বৃদ্ধি পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সৃষ্টি করবে নতুন কর্মসংস্থান। সেখান থেকে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, ফলস্বরূপ পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধিচক্রের পুনঃপ্রবেশ। প্রধানমন্ত্রীর যোজনাসমূহ ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রময়ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে একই পদ্ধতিতে অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি হয়ে উঠবে অনুঘটক।

দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে করছাড়ের সুবিধা দিলেও অপেক্ষাকৃত ঋণী অংশের থেকে বর্ধিত কর আদায় করে সেই অর্থ রাষ্ট্রোন্নতিতে ব্যয় করতে পিছপা হয়নি এবারের বাজেট। যাদের বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে তাদের আয়করের ওপর ১০ শতাংশ সারচার্জ বসানো হয়েছে এবারের বাজেটে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের 'কুসুমাদপি কোমল' এবং 'বজ্রাদপি কঠোর' দুই রূপই দেখেছে দেশবাসী।

তবে সহস্র ভাল কাজ যিনি করেন তাঁরও একটি-দুটি ভুল হতে পারে। যেমন এবারের বাজেট এফ আই পি বি তুলে দেওয়া হয়েছে, এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বেশি এসে দেশের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে আশা করা যায়। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কৌশলগত বিনিয়োগ করে শত্রুভাবাপন্ন কিছ দেশ (যেমন চীন) ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবেও ভবিষ্যতে বিপদে ফেলতে পারে। তাই সাময়িক বিদেশি বিনিয়োগের আশায় এফ আই পি বি বাজেট তুলে না নিলেই হয়তো ভাল হোত। এইটুকু বাদ দিলে একথা বলাই যায়, এবারের বাজেট দেশবাসীর প্রত্যাশার ঝাঁপি ভরিয়ে দিয়েছে। ■

চিঠিপত্র

রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের প্রকৃত কাহিনি

প্রচলিত কাহিনি বলে— নগর ভ্রমণে বেরিয়ে যথাক্রমে জরাতুর, বৃদ্ধ, রুগ্ন মানুষ এবং মৃত্যুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শাক্যরাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট, শোকতাপ গভীরভাবে অনুভব করেন। অনুরূপভাবে আর একদিন নগর ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি এক সন্ন্যাসীর দেখা পান। তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস কী ও কেন, সে বিষয়ে অবহিত হয়ে একদিন গভীর রাতে সকলের অজান্তে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ওই প্রসঙ্গে ধর্মানন্দ কোসম্বি 'ভগবান বুদ্ধ' পুস্তকে (পৃ. ২৬৭) বলেছেন--- মহাপদানসুত্তের প্রারম্ভে গৌতমবুদ্ধের পূর্বজাত ছয়জন বুদ্ধের জীবন-চরিত এবং সংক্ষেপে গৌতমবুদ্ধের জীবন-চরিত দেওয়া আছে। সেই ছয়জন বুদ্ধের প্রথম জন হলেন ক্ষত্রিয় রাজা বন্ধুমা-র পুত্র বিপস্‌সীকুমার। বিপস্‌সীকুমার বুদ্ধের সংসার-ত্যাগের পৌরাণিক কাহিনিটি গৌতমবুদ্ধের জীবন-চরিতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ধর্মানন্দ কোসম্বি বলেছেন, গৌতমবুদ্ধের জীবন-চরিতে অনেক বাজে জিনিস ঢুকেছে। সে কারণে, জনসমাজে প্রসিদ্ধ হবার জন্য নয় শুধু সত্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন (পৃ. ৯, ১৫)। মূল গ্রন্থের ভাষা মারাঠি।

অরিয়পরিয়েসনসুত্তে স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁর গৃহত্যাগের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন— 'হে ভিক্ষুগণ, যদিও আমি পূর্ণ যৌবনাবস্থায় ছিলাম এবং আমার পিতামাতা আমাকে অনুমতি দিচ্ছিলেন না, অনবরত কান্নাকাটি করছিলেন, তথাপি আমি মাথা মুড়িয়ে কাষায় বস্ত্র পরে গৃহত্যাগ করেছিলাম।' উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মানন্দ কোসম্বি বলেছেন— বাড়ির লোকদের কিছু না জানিয়ে সারথি ছন্নককে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব অশ্ব কন্থকের পিঠে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, একথা একেবারেই ভুল (পৃ. ৯৩)। শ্রীকোসম্বি বলেছেন— অঙ্গুত্তরনিকায়ের চতক্কু নিপাতে (সুত্ত ১৯৫) বয়োবৃদ্ধ বন্ন শাক্যের কাহিনি আছে। বন্ন নির্গ্রন্থ (জৈন) শ্রাবক ছিল। অর্থাৎ, গৌতমবুদ্ধের জন্মের পূর্বেই শাক্যদেশে জৈনধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং বুদ্ধদেব যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কিছু জানতেন না, তা মোটেই সম্ভবপর নয় (পৃ. ৮৬)।

পাক্ষিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (১.৫.১৯৯৯) 'রাজনীতির চাপে পড়েই গৌতমবুদ্ধ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন' শীর্ষক পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক শান্তিরঞ্জন বিশ্বাসের লেখা 'রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস নেওয়ার কারণ' রচনা-সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন— রোহিণী নদীর জলসেচ করে শাক্য ও কোলিয়দের রাজ্য দুটির চাষ-আবাদ চলত। পার্বত্য নদীটিতে পর্যাপ্ত জল না থাকার কারণে জল নিয়ে তাদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ লেগেই থাকতো'। তাই, প্রতি বৎসর উভয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতেন, কারা আগে এবং কতটা জল নেবে। কিন্তু গোল বাধল সে বছর কোলিয়রা বিধি ভেঙ্গে খুশিমতো জল তুলতে লাগল; যার ফলে, শাক্যদের চাষ-আবাদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সময় কপিলাবস্তু একটি গণতান্ত্রিক 'সঙ্ঘ' রাজ্য ছিল। শাক্য-সেনাপতি সঙ্ঘের সভায় কোলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব দেন। যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি সিদ্ধার্থের স্বাভাবিক অনীহা ছিল। তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন— যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান নয়। যুদ্ধ দ্বারা কেবল আর একটা যুদ্ধের বীজই বপন করা হয়। তিনি স্নেহ-দয়া, প্রেম-ভালবাসায় শত্রুজয়ের কথা বলেন। শাক্য-সেনাপতির যুক্তি ছিল--- নীতিবাক্যের সময় এটা নয়। কোলিয়দের কঠোর শাস্তি না দিলে তাদের এই আগ্রাসন কোনোদিন শেষ হবে না। দীর্ঘ বাদ- প্রতিবাদের পর প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট নেওয়া হয়। ভোটে সিদ্ধার্থ হেরে যান। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন; ঘোষণা করেন, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না। সেনাপতি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন, সঙ্ঘ-সদস্য হিসাবে তিনি সঙ্ঘ-সভার সার্বিক সিদ্ধান্ত মান্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সঙ্ঘ-সভার বিরোধিতা করলে তাঁর রাজপরিবার সামাজিক ভাবে একঘরে হতে পারে; সরকারিভাবে তাঁদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে; তাঁর নির্বাসন বা প্রাণদণ্ডও হতে পারে। সিদ্ধার্থ সব শুনলেন; কিন্তু যুদ্ধে যোগদান না করতে তিনি বদ্ধপরিকর। একই ভাবে তিনি বললেন, তাঁর পরিবারে সবাই নির্দোষ। তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে বরং তাঁকে নির্বাসন বা প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। ওই নিয়ে আরও অনেক কথা হয়। অবশেষে স্থির হয়, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবেন। শোকাতুর পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে, পত্নী যশোধরার সম্মতি নিয়ে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। যশোধরা সিদ্ধার্থকে বলেছিলেন— আমি সব জেনেছি। তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। একমাত্র রাহুলের জন্য আমি তোমার সঙ্গে সন্ন্যাস নিতে পারছি না...। সুতরাং রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গভীর রাত্রে অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেননি।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

মৌলবাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র আজ পশ্চিমবঙ্গ

ড. জিষ্ণু বসু

পশ্চিমবঙ্গের মৌলবাদী রূপান্তরের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। সিদ্দিকুলা চৌধুরী বিগত ১৫ বছর ধরে জামাত-উল-ইলেমা-হিন্দ সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বভার বহন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর জামাত গত ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরে বর্ধমান শহরে একটি বিরাট মৌলবাদী সভা করে। সেই সভা থেকে বিস্ফোরণে যুক্ত জঙ্গিদের হয়ে আদালতে লড়বার জন্য টাকা তোলার আহ্বান রাখেন সিদ্দিকুলা। জনাব সিদ্দিকুল্লা আজ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের গণশিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। বর্তমান সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শিশুশিক্ষার ইসলামিকরণ শুরু করেছে জোর কদমে। বাংলার শিশু শিখবে যে আকাশে 'রংধনু' ওঠে 'রামধনু' আর ওঠে না। মানে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র বা কাজী নজরুল ইসলাম 'রামধনু' লিখে সাম্প্রদায়িক কাজ করেছেন! এমনই অবিবেচনা প্রসূত পরিবর্তন হয়ে চলেছে মৌলবাদীদের তুষ্ট করার জন্য। এরই একটি ধাপ হিসাবে জামাত এবছর পশ্চিমবঙ্গে স্কুলে-স্কুলে মিলাত-উল-নবি উৎসব পালনের ডাক দেয়। মন্ত্রী স্বয়ং জামাত রাজ্য কমিটির সদস্য হলেও প্রায় কোনো স্কুলই এতে সাড়া দেয়নি। কারণ স্বাধীনতার আগে থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্কুলে ওইরকম কিছু হয়নি। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ না চাইলেও, বহিরাগত মৌলবাদীরা কিছু ছাত্রকে সামনে রেখে স্কুলগুলোতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, মৌলবাদের সেই আগুনে জ্বলতে জ্বলতে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল উলুবেড়িয়া থানার তেহট্ট হাইস্কুল। উলুবেড়িয়া থানার তেহট্ট গ্রামের সম্পন্ন পরিবার ছিলেন ভুঁইয়ারা। তাঁরা বেশ কিছু জমি শ্রীশ্রী জগন্নাথ জিউয়ের নামে দেবত্র করে। রথযাত্রার সময় ভগবান জগন্নাথের রথও বের হয়। এই দেবত্র করা জমির উপর ১৯৫২ সালে তৈরি হয়েছে তেহট্ট হাইস্কুল। বিগত কয়েক দশক ধরে হাওড়া জেলায় ব্যাপক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যার অসম বৃদ্ধি ও লাগাতার সন্ত্রাসের ভয়ে তেহট্টের মতো বহুস্থানে হিন্দুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। এই স্থানগুলোই হয়ে উঠেছে জামাতের মতো মৌলবাদী সংগঠনের ঘাঁটি। গত ডিসেম্বরে তেহট্টে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির ভাই কাশিম সিদ্দিকি এসে তেহট্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল ভৌমিকের নামে ফতোয়া দেন। কাশিম বলেন যে স্কুলে নবিদিবস না করতে দিলে হেডমাস্টার মশাইকে ঘেরাও করে রাখা হবে, পালাতে দেওয়া হবে না। এই ত্বহা সিদ্দিকি ও কাশিম সিদ্দিকি তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের একান্ত ঘনিষ্ঠ। গত নির্বাচনের আগে কলকাতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে ত্বহা সিদ্দিকি বলেন যে তাঁরা চাইলে এক মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করতে পারেন। এইসব সাম্প্রদায়িক ফতোয়াতে অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেঙে না পড়ে স্কুলে নবিদিবস পালনের অনুমতি দেয়নি। ১৩ ডিসেম্বর বহিরাগত মৌলবাদীরা স্কুল আক্রমণ করে। স্কুলের মাঠে তোলা হয় জামাতের সবুজ পতাকা। তার পরের দিন থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে, র‍্যাপ নামিয়ে অবশেষে ৬ জানুয়ারি স্কুল খোলা হয়। এত কিছু করেও শেষ রক্ষা হয়নি। গত ২৭ জানুয়ারি আবার মৌলবাদীরা প্যান্ডেল করার সামগ্রী নিয়ে স্কুলে ঢোকে। সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে দেয় সারাদিন। হেডমাস্টারমশায় বা পরিচালন সমিতি—কারও অনুরোধেই পুলিশ সেদিন সাহায্য করতে আসেনি। এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকার ঘরে বন্ধ দিদিমণিরা কাঁদতে থাকেন। দিদিমণিদের বাড়ির লোকেরা এসে মুক্তির জন্য হাতেপায়ে ধরলে, মৌলবাদীরা স্কুলের চাবি কেড়ে নিয়ে সে রাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাড়ি যেতে দেয়।

পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রী (উপরে) এবং ছাত্রীদের প্রতিবাদ (নীচে)।

মৌলবাদীদের কাবু করতে না পেরে প্রশাসন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি হাওড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশন তেহট্ট স্কুলকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওখান থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। অসহায় ছাত্রছাত্রীরা ৩১ জানুয়ারি ৬ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ সরাতে পুলিশ লাঠি চালায়। লাঠির আঘাতে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রী। মৌলবাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র আজ পশ্চিমবঙ্গ। বাংলা ভাষাকে ইসলামিকরণ করে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসের পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে মৌলবাদের পাঠ। তেহট্ট হাইস্কুলের ঘটনা দেখিয়ে দিল কতটা নিরাপত্তাহীন শিক্ষিকারা, মৌলবাদের কাছে কত অসহায় এই নিষ্পাপ ছাত্রছাত্রীরা। ■

ওঙ্কারে সবার অধিকার

সুভাষ মোহান্ত

ওঙ্কার কী—

ওঁ বা ওম্ কার শব্দ জগতে ত্রিকালজয়ী বিপ্লব। বিশ্বে একমাত্র ভারতীয় ঋষিরা এই শব্দের উদ্ভাবক। ওঁ-এর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করছেন। ওঁ = অ উ ম। অ—অগ্নি-ব্রহ্মা-সৃজনকর্তা, উ—উমেশ-বিষ্ণু বা পালক, ম—মহেশ্বর-লয় বা বিনাশক কর্তা। ওঁ-এর মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় শব্দভাণ্ডার তাল-লয়-ছন্দ সহযোগে অবস্থান করছে। ওঁ-এ সিদ্ধ হলে যে কেউ পৃথিবীর যে-কোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন। অদ্ভুত এবং আশ্চর্য বিষয়— এই ওঁ-এ সিদ্ধ মানব শুধু মানুষের নয়, পশু পাখির ভাষা পড়তে, বলতে ও বুঝতেও সক্ষম হন। ওঙ্কার সিদ্ধ হলে বোধ সিদ্ধি সহ কণ্ঠ, ঐশ্বরিক গুণযুক্ত কিন্নর কিন্নরী সুলভ হয়ে যায়। ওঁ তন্ত্র, মন্ত্র ও যোগ সিদ্ধির সেতু। ওঙ্কারে আসন সিদ্ধি হয় যা শীত গ্রীষ্মে শরীরের বিকার জন্মাতে দেয় না।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত"

ব্রহ্মের নিকটতম প্রতিশব্দ হলো ওম্। কেউ যখন ওম্ উচ্চারণ করেন তখন তিনি ব্রহ্মেরই উপাসনা করছেন বুঝতে হবে। ওম্ এই শব্দ দিয়ে উদ্‌গীথ গাওয়া হয়। ওঙ্কারে সত্যসিদ্ধি বা বাক্ সিদ্ধি আসে।

ওম্ ব্রহ্মসমার্থক। ওমে চিত্তের মলিনতা দূর হয়। ওম্ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে হয়। এতে ধীরে ধীরে বাক্ সিদ্ধি, নাদ সিদ্ধি আসে। মন পবিত্র হতে থাকে। সব অবস্থাতেই অনবরত ওম্ আবৃত্তি করে যেতে হয়। কিছুকাল ওম্ আবৃত্তি করবার পর থেকে ওম্-এর রসাস্বাদন লাভ হতে থাকে। ওঙ্কারে কুল কুণ্ডলিনী-সহ শরীরের অভ্যন্তরীণ ষড়চক্র জেগে ওঠে, বীর্য ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। শরীর থেকে পদ্মগন্ধ বের হতে থাকে।

"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ
পরার্ধ্যোহষ্টমে যাদুদ্‌গীথঃ"

সব রস বা সারসমূহের মধ্যে উদ্‌গীথ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে উদ্‌গীথ পরম বস্তু। পৃথিবী ইত্যাদি রস সমূহের মধ্যে পর্যায় ক্রমে ওম্ অষ্টম স্থানের আধিকারী। তা সত্ত্বেও এই উদ্‌গীথ-ই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে।

"এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ।
অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো
বাচ ঋণ্ রসঃ ঋচঃ সামরসঃ সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ।"

—*ছান্দোগ্য উপনিষদ।*

—পৃথিবী হলো এই চরাচর ভূতসমূহের সার। জল পৃথিবীর সার। উদ্ভিদ জলের সার। মানুষ উদ্ভিদের সার। বাক্ মানুষের সার, ঋক্‌বেদ বাকের সার। সামবেদ ঋগ্বেদের সার এবং ওঙ্কার বা উদ্‌গীথ হলো সামবেদের সার।

ওঙ্কার সম্মতিসূচক শব্দ। ওম্ কথাটির অর্থ হলো 'হ্যাঁ'। একবার শাকল্য নামক জনৈক ঋষি, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন 'দেবদেবীর সংখ্যা কত?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন 'তেত্রিশ'। শাকল্য তখন ওম্ উচ্চারণ করে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

যখন কেউ ওম্ উচ্চারণ করেন তখন তার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায়। এই অক্ষর আবার বক্তার বল, বীর্য ও সমৃদ্ধিরও পরিচয়। ওম্ সমস্ত যাগ-যজ্ঞ-বলের প্রথম ও অপরিহার্য শব্দ। ওম্ শক্তিসূচক শব্দ। ওঙ্কার সাকার-নিরাকার। জেনে, না-জেনে ব্যবহারকারীই সুফল ভোগ করেন, এই শব্দের এমনই তেজ। ওমের প্রতিক্রিয়া সৃজনাত্মক।

দেবাসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধও হয়েছিল। দেবতারা উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরদের পরাজিত করবেন বলে উদ্‌গীথ গ্রহণ করেছিলেন। ফলত দেবতারা হয়েছিলেন আত্মসংযমী ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। অসুররা অসংযত, তাদের বুদ্ধিও স্থূল। দেবতারা ধর্মের এবং অসুররা অধর্মের প্রতীক। পরিণতি যা হওয়ার তাই হলো। আজকের সমাজেও দৈবী ও অসুরিক গুণের প্রভেদ প্রকট। উদগীথ বা ওঙ্কার ধারক-পালকরা দৈবীগুণের হয়ে যান। ওঙ্কার প্রণব, প্রণব-ই ওঙ্কার।

ওঙ্কার নাক (প্রাণ বায়ু), কান (শ্রবণ), মুখ জিহ্বা (আস্বাদ),

মন- সহ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পবিত্র ব্রহ্মমুখী করে তোলে। ওঙ্কার আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গ বা ইন্দ্রাদির সারাৎসার।

ওঙ্কারের উপাসনা করলে সমস্ত আরাধ্য দেবতার উপাসনা করা হয়ে যায়। ওঙ্কার উপাসনায় আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক ও আদি ভৌতিক এই তিন রকমের ফল পাওয়া যায়।

ওঙ্কার প্রাণের কারক। সৃজনের কারক। সূর্যদেব নিজেই সব সময় ওঙ্কার জপ করে চলেছেন। সূক্ষ্ম চেতনার মানব সূর্যদেবের নিরন্তর ওঙ্কার জপের শব্দ শুনতে পান। সূর্যদেবের এই গীত জীবের কল্যাণের জন্যই। সুতরাং মানবেরও ওঙ্কার জপের মধ্য দিয়ে সূর্যের উপাসনা করা উচিত, সূর্য বা সৃজনকর্তাকে ওঙ্কার জ্ঞানে জপ করা উচিত। উচ্চকোটির মানব নিয়ত এটিই করে চলেন।

আমাদের আত্মাও প্রতিনিয়ত ওঙ্কার জপ করে চলেছেন, (দশ আঙুল দ্বারা চোখ, নাক, মুখ, কান একটু জোরে চেপে ধরে দেখুন) ইন্দ্রিয়জয়ী যোগীরা অন্তরের এই উদ্‌গীথকে সাকারাত্মক দেখেন।

সুখাসনে বা যিনি যাতে সাবলীল, সেই আসনে বসে মাথা, ঘাড়, মেরুদণ্ড সোজা বা এক সরলরেখায় (দেওয়ালের মতো) রেখে ওঙ্কার (যত দীর্ঘ সম্ভব) উচ্চারণ করতে থাকলে গুহ্যমূল থেকে ক্রমে সারা শরীর রিণ রিণ করে বাজতে বা কাঁপতে থাকে। কপালের ঊর্ধ্বাকাশে ক্রমে সুগন্ধি ফুলমালিকা রচনা হতে থাকে। সমবেত ভাবে ওঙ্কার জপে বন্ধ চোখেও এই মালার প্রকাশ ও অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

ব্যান বা কুম্ভককে ওঙ্কার জ্ঞানে আরাধনা করা উচিত। ব্যান হলো শক্তি, (শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের মধ্যবর্তী সময়) ব্যান ছাড়া বাক্য, কর্ম হয় না। সুতরাং শ্বাস বায়ু রুদ্ধ করেই উদ্‌গীথ গাওয়া উচিত।ওঙ্কার অক্ষর ব্রহ্ম। অক্ষর ব্রহ্ম ও ওম্ সমার্থক শব্দ। যেহেতু ব্রহ্ম অভয়, অজর ও অমর সুতরাং অক্ষর এবং ওঁঙ্কারও ভয়শূন্য ও মৃত্যুহীন।

উদ্‌গীথ—উদ্ হলো সমার্থক, উদ্ ও ব্রহ্ম অভেদ। সূর্যলোকের উর্ধ্বেও যে সব লোক আছে তারও অধীশ্বর 'উৎ'। যিনি শুদ্ধ ভাবে, স্পষ্ট উচ্চারণে উদ্‌গীথ বা ওঙ্কার সদা সর্বদা কাজে-অকাজে প্রাণ আপ্রাণ-ব্যানে উচ্চারণ করে যান তিনিই উদ্‌গাতা, তিনিই ব্রহ্ম সমার্থক, ব্রহ্মলীন হয়ে যান। তার সব উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যায়।

উদ্‌গীথ শব্দের অর্থ—

'উৎ', 'গী' ও 'থ' এই তিনটি বর্ণের সমষ্টি। 'উৎ' শব্দের অর্থউত্থান, উত্তরণ, প্রাণ, সামবেদ, সূর্য বা স্বর্গ। 'গী' শব্দের অর্থ বায়ু, আকাশ, যজুর্বেদ, স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী অংশ। 'থ' শব্দের অর্থ অগ্নি, অন্ন, ঋকবেদ, প্রকৃতি, ভূমি বা জল। পশু সমূহের মধ্যে গোরু উদ্‌গীথ। কাল সমূহের মধ্যে বর্ষা। *'গাব উদ্‌গীথঃ'—ছান্দোগ্য উপনিষদ।*

ওঁ নিয়ে বিতর্ক—

শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের ওঁ উচ্চারণের অধিকার আছে। বৈশ্য, শূদ্র, নারীদের জন্য ওঁ শব্দ নয়। 'নমঃ' শব্দ। নমঃ শব্দ তাদের জন্য লিঙ্গহীন, নপুংসক বা সমলিঙ্গ মন্ত্র। কিন্তু ওঙ্কার কেন সকলের জন্য নয়? এ প্রশ্নের অবশ্য সদুত্তর পাওয়া যায় না। মনুসংহিতায় এ বিষয়ে প্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৭ জন মনু'র কোনো মনু এই নির্দেশ জারি করেছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত বৌদ্ধ, জৈন বা মুসলমান আমলে মনুসংহিতায় শব্দটা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশেষত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্বার্থান্বেষী কারোর অপকীর্তি এটা। আর্য ঋষিরা জীবের কল্যাণে মানবের কল্যাণে তাঁদের যোগলব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন। সেখানে আবার জাত-পাত, নারীপুরুষের ভেদাভেদ কেন? ওঁ সার্বজনীন—সকল মানবের।

জপের প্রকারভেদ

জপ তিন প্রকার।

১. মানস জপ— মন্ত্রের অর্থ স্মরণপূর্বক মনে মনে যে জপ তাকে মানস জপ বলে। এই জপ শ্রেষ্ঠ, সাত্তিক গুণসম্পন্ন, সিদ্ধিপ্রদ।

২. উপাংশ জপ— মন্ত্রের অর্থ দেবতাকে স্মরণ করে শুধু মাত্র জিভ ও ঠোঁট নেড়ে জপ। এই জপ রজগুণসম্পন্ন মধ্যম শ্রেষ্ঠ। এই জপ পুষ্টি কর্মে সিদ্ধি আনে। উচ্চারণে যে শব্দবিশেষ অন্যের কর্ণগোচর হয় না, তাই উপাংশু জপ।

৩. বাচিক জপ— স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা হয় যে জপ তা বাচিক জপ। এই জপ অধম গুণসম্পন্ন, অধমশ্রেষ্ঠ। মন্ত্র স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা অন্যেরও কর্ণগোচর করে হয়। এই জপ তমঃগুণ সম্পন্ন, তান্ত্রিক মারণ উচাটনাদি কর্মে এই জপ ফলদাতা হয়।

''মানসঃ সিদ্ধি কামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ।
বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ।।"

জপের সেতু ওঁ—

তত্র সেতুং বিনা জপস্য ব্যর্থত্বাত্তন্নিরূপ্যতে।
শাস্ত্রানাং প্রণব সেতুর্মন্ত্রানাং প্রণবঃ স্মৃতঃ।।
স্রবত্যনৌঙ্কৃতঃ পূর্বং পরস্তাঞ্চ বিশীর্য্যতে।
নিঃসেতু সলিলং যদ্বৎ ক্ষণাগ্নিস্মং প্রগচ্ছতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতু ক্ষণাৎক্ষরন্তি মজ্জ নাম।।
চতুর্দশ্যে স্বরো সোহসৌ সেতুরৌকার সংজ্ঞকঃ।
স চানুস্বারণাদাভ্যাং শুদ্রানাং সেতুরুচ্যতে।।

সেতুবিহীন জপ নিষ্ফল হয়। ওঙ্কার হলো সফল মন্ত্রের সেতুস্বরূপ। সেতুর সাধারণ অর্থ হলো সংযোগ। কাজেই মন্ত্র ও দেবতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হলো ওঁ। সংযোগ ব্যতীত জপ নিষ্ফল। কাজেই জপের পূর্বে ওঙ্কার রূপ সেতু প্রয়োগ করতে হয়। তা না হলে সেই জপ নদীগর্ভে পতিত হবার মতই নিষ্ফল হয়। চতুর্দশ স্বরবিন্দু নাদ মণ্ডিত ওঙ্কার স্ত্রীলোক ও শূদ্রদেরও জপের সেতুর কাজ করে। —তাই ওঙ্কারে সবার অধিকার। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমারসন : (১৮০০-১৮৮২)

পরিচিতি : ইনি আমেরিকার অন্যতম প্রাবন্ধিক, লেখক, অধ্যাপক এবং একত্ববাদী ধর্মযাজক। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে অতীন্দ্রিয়বাদের পুরোধাপুরুষ। তাঁর লেখা হেনরি ডেভিড থরো, ফ্রেড্রিক নিট্‌শে, উইলিয়াম জেম্‌স, এমিল আরমান্ডো, এমা গোল্ডম্যান, মারসেল প্রাউন্ট এবং হারল্ড ব্লুম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : বেদ আমাতে ভাবনার ঝড় তোলে। তার মধ্যে আমি পেয়েছি অবিচ্ছিন্ন শান্তি, শাশ্বত সান্ত্বনা এবং অসীম শক্তি।

উৎস : দি কোমেমোরেটিভ সংস্কৃত স্যুভেনির, ২০০৩, ভারতীয় বিদ্যা ভবন।

উদ্ধৃতি : একটা সুন্দর দিন পাবার জন্য আমি ভগবৎ গীতার কাছে ঋণী। সেটা ছিল যেন এক সাম্রাজ্য। আমাদের শুনিয়েছিল এক বিশাল, নির্মল ও অটল প্রাচীন সত্তার শাশ্বত বাণী ও উপদেশ, যাতে ছিল না কোনো ক্ষুদ্রতা বা তুচ্ছতা এবং যা ঘটেছিল অন্য যুগে এবং অন্য এক অবস্থায় : যে প্রশ্নগুলি আজও আমাদের জীবনকে আলোড়িত করে, সেখানে তারও সমাধান ছিল।

উৎস : সেক্রেড জুয়েল অব্ যোগা— দাভে দ্য'লুকা।

উদ্ধৃতি : সমস্ত বিজ্ঞানই অবিনশ্বর হয়। তা না হলে তা নিঃশেষ হয়ে যেত। উদ্ভিদবিদ্যা সঠিক পথে আসতে শুরু করেছে— ব্রহ্মার অবতারের কথা এবার লেখা হবে জীবতত্ত্বের পুস্তকেও।

উৎস : আটোবায়োগ্রাফি অব্ এ যোগী পরমহংস যোগানন্দ।

বি. দ্র. : বিখ্যাত লেখক থমাস কার্লাইল এমারসনকে লিখেছিলেন— 'এই ভগবৎ গীতা একটি বিশাল অনুপ্রেরণাদায়ক পুস্তক। এটা আমার জীবনে শান্তি এবং সান্ত্বনা এনে দিয়েছে। আশা করি তোমার জীবনেও তাই হবে। এটা পড়ে দেখ'।

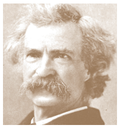

মার্ক টোয়েন : (১৮৩৫-১৯১০)

পরিচিতি : ইনি আমেরিকার অন্যতম ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুক সাহিত্য রচয়িতা, অধ্যাপক ও লেখক। তাঁকে প্রায়ই বলা হয় সমসাময়িক আমেরিকার অন্যতম কৌতুক সাহিত্যকার।

উদ্ধৃতি : ভারত হচ্ছে বহু ধর্মাবলম্বীদের দেশ এবং মানব জাতির শৈশবস্থল। ইহা সমস্ত ভাষার জননী, পৌরাণিক কাহিনির মাতামহী এবং ঐতিহ্যের প্রপিতামহী। অন্তত একবারের জন্যও সব মানুষেরই ইচ্ছা ভারতভূমির দর্শন করা। আর ওই এক ঝলক দেখা যেন সমগ্র বিশ্বকে দেখার থেকেও মহত্ত্বপূর্ণ।

উৎস : মার্ক টোয়েন অন দ্য লেকচার সার্কিট—পল ফ্যাটাউট।

উদ্ধৃতি : মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান এবং শিক্ষাপ্রদ বিষয়গুলি ভারতের ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে।

উৎস : দ্য ড্রাগন অ্যান্ড দ্য এলিফান্ট : চায়না, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার— ডেভিড স্মিথ।

নীল্‌স বোর : (১৮৮৫-১৯৬২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ডেনমার্কের অন্যতম পদার্থ বিজ্ঞানী। ইনি পারমাণবিক কণার গঠন ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উদ্ভাবনে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর অন্য অবদানগুলি হলো, বোর ম্যাগ্নেটন এবং সোমারফিল্ডবোর থিয়োরি। তিনি পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান ১৯২২ সালে।

উদ্ধৃতি : আমার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাই উপনিষদের গভীরে।

উৎস : ইন্ডিয়ান কনকোয়েস্ট অফ্ মাইন্ড— শৈবাল গুপ্ত।

উদ্ধৃতি : এটা ভাবতে অবাক লাগে যে শ্রোয়েডিঙ্গার, নীল্‌স বোর এবং ওপেনহাইমারের মতো বিজ্ঞানীগণ উপনিষদের ছাত্র ছিলেন।

উৎস : 'ইন্ডিয়ান কন্‌কোয়েস্ট অফ্ দ্য মাইন্ড'—শৈবাল গুপ্ত।

অ্যানড্রু টমাস : (১৯০৬-২০০১)

পরিচিতি : ইনি ইউ এফ. ও বিষয়ে একজন অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তকের রচয়িতা। ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উপর তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকটি, 'উই আর নট দ্য ফার্স্ট'।

উদ্ধৃতি : পদার্থের আণবিক গঠনের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শনে বর্ণিত হয়েছে। যোগবশিষ্ঠতে উল্লেখ আছে— প্রতিটি পরমাণুর অন্তররাজ্যে বিরাজমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যা সূর্যরশ্মির মতো বহুবিধ কণিকার সমন্বয়ে গঠিত, তা আজকের যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

উদ্ধৃতি : পুরাকালে দিন ছিল ৬০ কলায় বিভাজিত আর প্রতিটি কলা ছিল ২৪ মিনিটের, যা উপবিভাজিত হতো ৬০ বিকলাতে আর প্রতিটি বিকলা ছিল ২৪ সেকেন্ডের। তারপরেও আরও ৬০ বার ক্রমাগত বিভাজন করে সময়ের একক তৈরি করা হয়েছিল। পরা, তৎপরা, বিতৎপরা, ইমা এবং সবশেষে কাষ্ঠা, যা আজকের হিসাবে এক সেকেন্ডের ০.০০০০০০০৩ ভাগ অংশ। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা কি প্রযুক্তিগত ভাবে এক অতি উন্নত সভ্যতার নিদর্শন নয়? অতি সংবেদনশীল সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এই 'কাষ্ঠা' পরিমাপ অসম্ভব নয় কি? এই তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার প্রচলন ছিল।

উৎস : উই আর নট দ্য ফার্স্ট : বিড়ল অফ্ আনসেন্ট সাইম— অ্যানড্রু টমাস।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁডুলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

বইপ্রেমী

টুপাই বই পড়তে খুব ভালোবাসে। শুধু পড়া নয়, বইয়ের অযত্ন হলেও তার মনে খুব কষ্ট হয়। যতক্ষণ না সেটিকে ভালো করে রাখা হচ্ছে ততক্ষণ মনের ভিতর একটা চাপা অস্বস্তি হয়। একবার বাড়িতে এলো তার এক মামাতো দাদা। তারও বই পড়ার খুব নেশা। সে রাতে একটা বই পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লো। বইটি উল্টে পড়ে রয়েছে টেবিলে। এই দৃশ্য চোখে পড়তেই টুপাই বইটি পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখলো। মনে মনে ভাবলো, তার এই দাদার বই পড়ার নেশা আছে, কিন্তু সে বইপ্রেমী নয়। বইপ্রেমী হলে কেউ এমন বইয়ের অযত্ন করতে পারে না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই দাদা দেখে তার রাতে পড়া বইটি বন্ধ করে সুন্দরভাবে আলমারিতে রাখা আছে, আর যে পর্যন্ত পড়া হয়েছে সেখানে একটি পেপার মার্ক। তাতে লেখা—বইয়ের সঙ্গে এমন করতে নেই।

টুপাইদের বাড়িতে অনেক বই। মা-বাবা দুজনই তাকে উৎসাহ দেয় নতুন নতুন বই পড়তে। প্রতি বছর জন্মদিনের উপহার মানেই রাশি রাশি বই। ইতিমধ্যে দুটি আলমারি ভর্তি। কাউকে কোনো উপহার দিতে হলে বই উপহার দেয়। কিন্তু কেউ বইয়ের অযত্ন করলে টুপাই তাকে বই পড়তে দেয় না। বাড়িতেও যাতে বইয়ের অযত্ন না হয় তাই সে কতগুলো নিয়ম চালু করেছে। এক, কেউ অনুমতি ছাড়া বইয়ে হাত দিতে পারবে না। দুই, বইয়ে পাতায় কিছু লেখা যাবে না। তিন, যেমন তেমন করে বই রাখা যাবে না। চার, পড়ার জন্য বই নিলে যেখানকার বই সেখানে রাখতে হবে।

এই নিয়মগুলি টুপাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বাকিদের জন্যও একই নিয়ম। একবার বাড়িতে এলেন টুপাইয়ের দিদিমা। তিনি তো আর অতশত জানেন না। তিনি টুপাইয়ের আলমারি থেকে একটি বই নিলেন। ব্যাপারটা নজরে পড়তেই সে দিদিমার পিছু নিল। সরাসরি কিছু বলতেও পারছে না। দিদিমা বই হাতে যেখানেই যান, টুপাই একটু দূরে দূরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়। আড়চোখে দেখে দিদিমা বইটি কেমন করে ধরছেন, ভিতরের পাতা জুড়ে দিচ্ছেন কিনা।

অবশেষে দিদিমা যখন পুনরায় বইটি আলমারিতে রেখে দিলেন তখন টুপাইয়ের মনে শান্তি এলো।

অনেকে বলে টুপাইয়ের এই বই-বাতিক অত ভালো নয়। পড়ার থেকে যত্ন বেশি। পড়তে গেলে একটু দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাতে কী এমন হয়! কিন্তু টুপাই তা মানতে নারাজ। তার মতে, বই পড়া মানে ভিতরের অর্থগুলো যেমন বোঝা তেমনি বাইরে থেকেও তার যত্ন নেওয়া। অযত্ন করলে বইয়ের কষ্ট হয়। বই পড়ব অথচ বইয়ের কষ্টকে অনুভব করব না তা কেমন করে হয়!

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

উজ্জয়িনী

এই ঐতিহাসিক নগর মধ্যপ্রদেশে শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনী ভারতের সাতটি পবিত্র নগরের মধ্যে একটি। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল এই উজ্জয়িনী। তখন এর নাম ছিল অবন্তিকা। এই রাজসভায় মহাকবি কালিদাস শ্রেষ্ঠ নবরত্ন ছিলেন। কার্তিকী পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীর তীরে প্রতি বছর মাঘমেলা বসে। প্রতি বারো বছরে একবার কুম্ভমেলা হয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকালেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির এই উজ্জয়িনীতে।

এসো সংস্কৃত শিখি

प्राय: तथा न स्यात्।

প্রায়শ তা হয় না।

चिन्ता मास्तु, श्व: ददातु।

কোনো চিন্তা নেই, আগামী কাল দেবেন।

अहं पुन: सूचयिष्यामि।

আমি আবার জানাব।

अद्य आसीत् किम् ?

আজ ছিলেন কি?

अवश्यम् आगमिष्यामि्।

অবশ্যই আসব।

ভালো কথা

বনভোজনে কম্বল দান

জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে আমাদের শাখার পারিবারিক বনভোজন ছিল ধুলিয়ানগঙ্গা পেরিয়ে পারলালপুরে শিবমন্দিরের বাগানে। সারাদিন ধরে খেলাধুলা, গল্প, আড্ডা, দুপুরের গঙ্গায় স্নান ইত্যাদিতে খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু খুব ভাল লাগলো যখন ডাক্তার ভূদেব জ্যেঠু সেখানকার ২০০ জন গরিব-দুঃখী মানুষকে কম্বল দান করলেন। সবাই লাইন দিয়ে এক এক করে কম্বল নিয়ে হাসিমুখে ফিরে গেল। বনভোজনে এরকম সেবাকাজ আমি প্রথম দেখলাম। আনন্দে মন ভরে উঠেছিল।

নিকিতা সাহা, অষ্টম শ্রেণী, বালিয়াডাঙ্গা, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) নী ণা দি বী

(২) হী প তা র্ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক গ তি তা গ নু

(২) ম ল ক জ গ কা

২৩ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) রচনাবলী (২) উত্তরণ

২৩ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পুনর্বাসন (২) পরম্পরা

উত্তরদাতার নাম

(১) বিশ্বনাথ পণ্ডা, বরাবাজার, পুরুলিয়া (২) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯
(৩) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা (৪) কঙ্কণা বর্মন, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অঙ্গনা

মাতৃজাতি অসহায় কেন ?

রুণা চৌধুরী (রায়)

পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য ও বাক্য পালন করাই আপনার-আমার মতো সন্তানদের ধর্ম। মায়ের ঋণ অপরিশোধ্য, বিশেষত সন্তান প্রতিপালনে মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হতেই যে শব্দ প্রথম উচ্চারিত হয় সে শব্দ 'মা'। মায়ের অঢেল স্নেহ- ভালবাসায় শিশু নিশ্চিন্তে বেড়ে ওঠে। স্লেটে হাতে খড়ি অ, আ, ক, খ বর্ণমালার ঝুলি। বাবা-মায়ের আঙ্গুলে ধরে হাঁটি-হাঁটি, পা-পা চলতে শেখানো। এরপর স্কুল, কলেজ ইউনির্ভাসিটি, বিদেশে উচ্চ ডিগ্রি পাওয়ার আশায় লাখ লাখ টাকা খরচ সেই সন্তানটির জন্য। এরপর কতরকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ ফেলের চিন্তা। পাশ করলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, শিক্ষক, রিপোর্টার কত কিছু পদে অলঙ্কৃত হতে পারে মা-বাবার ছত্রছায়ায়, প্রপার গাইডেন্সে। কিন্তু ওই শিশুরই পারিবারিক পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, দিনরাত মা-বাবার ঝগড়া, অশান্তি, অকথ্য ভাষা শুনে যদি সে বড় হয়, স্বভাবতই তার সুস্থ মন তৈরি হতে পারে না। ভেতরে তার অপরাধপ্রবণতা বাসা বাঁধে। বাবার এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স জানতে পেরে মায়ের চরম ক্রোধ— পরিণতি অনেকক্ষেত্রে ডিভোর্স--- এসব দেখে মনে হয় না সুনাগরিক হতে পারে। কারণ, ঘরের পরিবেশই সন্তানের উপর সু অথবা কু প্রভাব বিস্তারে প্রথম ভূমিকা নেয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে পা রাখতেও এখন প্রতিপদে বিপদ মেয়েদের ক্ষেত্রে। ইভটিজিং, কু-প্রস্তাব, তাতে সাড়া না দিলে কিডন্যাপ করে শেষ পর্যন্ত ধর্ষণ। পরে মার্ডার করে নদী, নালা, পুকুরে নিক্ষেপ। প্রেমে প্রত্যাখানের পরিণতি অ্যাসিড হামলা। বিকৃত দেহ, মুখ নিয়ে কষ্ট করে সমাজ জীবনে বেঁচে থাকা, কোথাও মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটে। চার বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধাকেও ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে অনেক জায়গায়। দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ডের পরও শত শত নির্ভয়াকাণ্ড প্রায়ই এখানে-ওখানে ঘটে চলেছে আর দুষ্কৃতকারীদের নির্মম আক্রমণে অকালেই ঝরে পড়ছে কত সুপ্ত প্রতিভা, মায়ের কোল খালি করে অন্তিম শয্যায় শায়িতা রক্তমাংসের দলাপাকানো শব। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে কোনো লাভই হচ্ছে না। পুলিশ ও আদালতের দরজায় বছরের পর বছর চলে মামলা। কোথাও অপরাধীরা ধরা পড়ে, সাজা ঘোষিত হয় কিন্তু পরিস্থিতি বদল হয় না।

কামদুনির নির্মম ঘটনার প্রতিবাদে টুম্পা এবং মৌসুমী কয়াল দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে উপযুক্ত বিচারের দাবি জানিয়ে ফাঁসির শাস্তি চেয়েছে। তাতে অনেকে সরব হয়েছে। আওয়াজ উঠেছে বিকৃত যৌন লালসার শিকার নিরীহ, নিষ্পাপ মেয়েদের কেন হতে হবে?

এর উৎস কোথায়? সেলুলয়েডের পর্দায় সেলিব্রিটিদের কামুক, উত্তেজক দৃশ্য, অর্ধনগ্ন পোশাকে খোলামেলা দৃশ্য যা মা-বাবা-বড়দের সঙ্গে বসে দেখা যায় না— সেই সব দৃশ্য অনেক পরিবারের ছেলেদের মনে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে। তাদের মস্তিকে সর্বদা কু-পরিকল্পনা চলতে থাকে, সুযোগের অপেক্ষায় থেকে শেষে হিংস্র পরিণতিতে সমাপ্তি ঘটে। এদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে বা নপুংসক করে দিলেও বুঝি বা মনের ক্ষোভ মেটে না।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে কর্মরত সফ্‌টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে নারকীয় ঘটনার শিকার হলো। রক্তাপ্লুত হয়ে রাস্তার উপর মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ল। বিদেশে সিরিয়াল কিলারেরও সন্ধান পাওয়া যায় যারা অসহায় একাকী মহিলাকে তুলে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর টুকরো করে কেটে উন্মত্ত হাসিতে ফেটে পড়ে। শিকার কে হলো? ওই নারী।

প্রশাসন অনেক সময় এফ আই আর নিতেই চায় না। থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। যে নারীর জঠর থেকে জন্ম, সেই মাতৃজাতির এত অবমাননা অথচ কোনো প্রতিকার নেই। এই পৃথিবীতে নারীজাতি যদি এতই দুর্বল হোত তবে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা, বাচেন্দ্রিপাল, আরতি সাহা, কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়মস, কিরণ বেদী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আরও কত শক্তিশালী নারী পুরুষের সঙ্গে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে নিজনিজ ক্ষেত্রে কি সফল হোত? সমাজে প্রকৃত শিক্ষার দরকার। নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রশংসা পুরুষদের মনে জাগরুক হওয়া দরকার। কুরুচিকর সিনেমা দেখা এবং সেরকম ছবি বানানো থেকে বিরত হওয়া উচিত। আমাদের ঐতিহ্যের ভারতবর্ষে এইসব অপরাধীদের ধিক্। পুরুষের পাশবিক অত্যাচারে নারীকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে কাঁদতে হচ্ছে কেন? মেয়েদের নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে ভাবা হচ্ছে না কেন? এর সমাধান কবে হবে কেউ তার সদুত্তর দিতে পারছে না। ■

শ্রীলঙ্কায় নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২ রাখতে চায় মুসলমানরা

অমলেশ মিশ্র

ভারতবর্ষের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির রূপায়ণে অনেকেই ভারতবর্ষে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার কথা বলেছেন। এই বিধি প্রবর্তনের ভূমিকা হিসাবে তিন তালাক দিয়ে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের যে রেওয়াজ এদেশের মুসলমান সমাজে আছে তা রদ করার দাবি উঠেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলছে। আর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেস তিন তালাক প্রথা প্রকাশ্যেই সমর্থন করেছে। তিন তালাক ব্যবস্থা মহিলাদের পক্ষে বেশ খারাপ। শিক্ষিতা মুসলমান মহিলারা এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করছেন বটে তবে সফল হননি। পশ্চিমবাংলা যে দ্রুত ইসলামিকরণের দিকে যাচ্ছে চোখ খোলা রাখলেই বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা করব না।

আজকের প্রসঙ্গ শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কায় এখন শ্রীলঙ্কা খোয়াইড জামাত নামে ওয়াহাবি-প্রভাবিত একটি মুসলমান সংগঠন কলম্বোর রাস্তায় নেমেছে এই দাবি নিয়ে যে মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২ রাখতে হবে। ১৬ করা চলবে না। শ্রীলঙ্কা সরকার একটি আইন প্রণয়ন করতে চায় যে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স হবে ১৬। শ্রীলঙ্কার অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ষোলই। শ্রীলঙ্কার এই বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন তাদের দেশের অর্থনৈতিক একটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, তা হলো Generalised System of Preferences (GSP) for materialising exports to European Union।

কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অধিক সংখ্যায় মুসলমান তৈরি করাই শ্রীলঙ্কা খোয়াইড জামাতের এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ইসলামের লক্ষ্য— (১) যে দেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেদেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তর করিয়ে মুসলমান করা অথবা দেশ থেকে বিতাড়ন করা। (যারা চোখ খোলা রেখেছেন তারা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন।)

আর (২) যে দেশে তারা সংখ্যাগুরু নয়, সেদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে ক্রমশ সেই দেশটিকে ইসলামি দেশে পরিণত করা। এই কাজের জন্য— (ক) কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে। (খ) পুরুষদের চারবার বিয়ে করার সুযোগ। (গ) ফ্যামিলি প্ল্যানিং না করার উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়।

একথা জানা আছে অনেকেরই যে অনেক ইসলামিক দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং আছে এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা— কোনো ধর্মীয় ব্যবস্থা নয়।

ভারতবর্ষ মুসলমান প্রধান দেশ নয়। তাই এদেশের মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশ (ক) (খ) (গ) পালন করেন বিশ্বাসের সঙ্গে।

ভারতবর্ষে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড একইরকম দেওয়ানি কার্যবিধি চালু করার বিরুদ্ধে। তারা তাদের শরিয়ত প্রথার অজুহাত দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো— দেওয়ানি কার্যবিধির ক্ষেত্রে যারা শরিয়তের অজুহাত তোলেন, তারা কেন ফৌজদারি কার্যবিধি ও আইনের ক্ষেত্রে শরিয়তের কথা তোলেন না? ফৌজদারি ক্ষেত্রে শরিয়ত এতই কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছে যে, মুসলমানরা তা

গত সাতটি জনগণনায় ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্রমহ্রাসমান চিত্র (শতাংশে)

রিলিজিয়ন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দুধর্ম	৮৪.১০	৮৩.৪৫	৮২.৭৩	৮২.৩০	৮১.৫৩	৮০.৪৬	৭৯.৮০
ইসলাম	৯.৮০	১০.৬৯	১১.২১	১১.৭৫	১২.০১	১৩.৪৩	১৪.২৩
খ্রিস্টান	২.৩০	২.৪৪	২.০০	২.৪৪	২.৩২	২.৩৪	২.৩০
শিখ	১.৭৯	১.৭৯	১.৮৯	১.৯২	১.৯৪	১.৮৭	১.৭২
বৌদ্ধ	০.৭৪	০.৭৪	০.৭০	০.৭০	০.৭৭	০.৭৭	০.৭০
জৈন	০.৪৬	০.৪৬	০.৪৮	০.৪৭	০.৪০	০.৪১	০.৩৭
জরথুষ্ট	০.১৩	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৮	০.০৬	—
অন্যান্য	০.৪৩	০.৪৩	০.৪১	০.৪২	০.৪৪	০.৭২	০.৯০

ইসলামিক দেশগুলিতে যে অ-মুসলমানদের থাকতে দেয় না— তা ওই দেশগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই জানা যায়।

সহ্য করতে পারবেন না। তাই তারা অপেক্ষাকৃত নরম ভারতীয় ফৌজদারি বিধি মেনে নিয়েছেন। এছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

ফৌজদারি ক্ষেত্রে যদি শরিয়ত বাধা না হয়, তবে দেওয়ানি ক্ষেত্রে তা বাধা দেওয়ার কথা নয়। তবু ওইসব মুসলমান সংগঠন বাধা দেয় কারণ তারা এদেশে, অন্যান্য অ-মুসলমান দেশের মতো, এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে এদেশকে ইসলামিক দেশে পরিণত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে চলছেন। এটি ইসলামি চিন্তনের একটি প্রধান দিক।

কয়েকটি ইসলামি দেশের হিসাব দেওয়া হলো

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলমান দেশে অ-মুসলমানদের বসবাস (শতাংশ হিসাবে)

আফগানিস্তান - ১, আলবানিয়া - ৩০, আলজিরিয়া - ১, আজারবাইজান - ১৩, বাহরিন - নেই, বাংলাদেশ - ১৩, মরক্কো - ২, মালদ্বীপ - নেই, কোমোবোল - ১, জিযুতি - ৬, ইজিপ্ট - ৬, জাম্বিয়া - ১০, মালয়েশিয়া - ৭, ইন্দোনেশিয়া - ১৩, ইরান - ১, ইরাক - ৪, জর্ডন - ৮, পাকিস্তান - ৩, তুরস্ক - ১, ইয়েমেন - ২, সংযুক্ত আরবআমিরশাহি - ৪, সিরিয়া - ১০, সোমালিয়া - ২, সৌদি আরব - নেই, মরোক্কো - ২। (সূত্র : যারা নিজেদের মুসলমান বলে গর্ববোধ করেন। পৃ. ৯১-৯২ অমলেশ মিশ্র)

ভারতের জনসংখ্যার যে হিসাব (সারণী দ্রষ্টব্য) দেওয়া হলো, তা থেকে বোঝাই যাচ্ছে একমাত্র ইসলামিদের জনসংখ্যাই এদেশে বাড়ছে। হিন্দু ধর্মের লোকেদের জনসংখ্যা ১৯৫১ থেকে ২০১১ সময়ের মধ্যে ৪.৩ শতাংশ কমেছে (৮৪.১ থেকে ৭৯.৮)। আর ইসলামি জনসংখ্যা বেড়েছে ৪.৪৩ শতাংশ বেড়েছে (৯.৮ শতাংশ থেকে ১৪.২৩)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়নি।

শ্রীলঙ্কায় মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে ২ শতাংশ। ৬ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ গত ২০ বছরের হিসাব। অপর দিকে শ্রীলঙ্কায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমেছে।

শ্রীলঙ্কায় এখন মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২ রাখার দাবিতে যে আন্দোলন হচ্ছে তার পোস্টারে ব্যানারে লেখা আছে--- 'সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না,' 'বিয়ের জন্য সর্বনিম্ন বয়স স্থির করা বাস্তবসম্মত নয়', 'শরিয়ত আইন নিয়ে ছেলেখেলা কোরো না' ইত্যাদি।

Indian Spend. Org ২০১৬ সালের মে মাসে একটি তথ্য দিয়েছে যে, যে মেয়েদের ১৫ বছরের নীচে বিয়ে হয়েছে তারা ২টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং ভারতে ১৯ মিলিয়ন মেয়ে সাত অথবা তার বেশি সংখ্যক সন্তান প্রসব করেছে।

আর একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে, যে মহিলারা উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন তারা কম সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেন— ১.৯ শতাংশ আর যারা অশিক্ষিত মহিলা তারা বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেন— ৬.৮ শতাংশ। (সূত্র : Truth 13.1.17, p. 9)

বারো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাদের শিক্ষার সুযোগ না দিয়ে সন্তান উৎপাদনে নিয়োগ করা, যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ করা এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং করা দুটোই দেশের অর্থনীতি ও ব্যক্তির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিয়ে করতে হয়। যে দেশে মুসলমান জনসংখ্যা সংখ্যাগুরু নয় অর্থাৎ ভারত, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদির মতো দেশে মুসলমান জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ দেশের অর্থনীতি বা ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো— মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। পৃথিবীটা মুসলমানদের জন্যই, অন্যরা থাকবে কেন? তারা সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামিক করতে এখনও পারেনি, তবে যেটি ইসলামিক দেশ, সে দেশে তারা অন্যদের থাকতে দিতে রাজি নয়। প্রদত্ত তথ্যগুলি অন্ধকেও দেখিয়ে দেয় যে মুসলমান সংখ্যাগুরুদেশে অন্য ধর্মের মানুষদের থাকার স্থান নেই।

যারা ইউনিফর্ম ক্রিমিন্যাল কোড বা অভিন্ন ফৌজদারি আইন মেনে নেন তারা অভিন্ন দেওয়ানি আইন মানতে রাজি নয়। প্রথম ক্ষেত্রে তারা শরিয়তের অজুহাত দেয় না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেয়।

জানা দরকার যে শরিয়ত মানা কোনো অ-মুসলমান প্রধান দেশের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। অভিন্ন ফৌজদারি বিধি শরিয়ত সম্মত না হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা মেনে নেয়। কারণ শরিয়তি শাস্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর এবং অভিন্ন ফৌজদারি আইন মেনে নিলে ইসলামি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গোপন অ্যাজেন্ডাটি অবিকৃত থাকে। কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মেনে নিলে ইসলামি জনসংখ্যা বৃদ্ধির গোপন অ্যাজেন্ডাটি সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই শ্রীলঙ্কা বা ভারতে ইসলামিদের একটি বৃহত্তর অংশ শরিয়তের অজুহাত তুলে আন্দোলন করে।

শ্রীলঙ্কায় মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ষোলো, তা সেখানকার অ-মুসলমান জনসংখ্যা মেনে নিয়েছে। মুসলমানরাই মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১২ রাখতে চান, কারণ তারা শ্রীলঙ্কায় মুসলমান জনসংখ্যা বাড়াতে চান। সেই উদ্দেশ্যে মেয়েদের কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। শরিয়তের উল্লেখ একটি অজুহাত মাত্র— যা তারা নিজেরাও সঙ্গত মনে করে বলে মনে হয় না। যেসব দেশ খ্রিস্টান জনসংখ্যা প্রধান সেসব দেশে তারা শরিয়তের প্রসঙ্গ সব সময় উত্থাপন করে কি?

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও হিন্দু জনসংখ্যা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের পাশে দাঁড়াবে— যাতে মহিলাদের স্বার্থ তথা দেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়। এমনটাই আমরা আশা করব। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

নানা দিক দিয়েই বর্তমান বাজেট অভিনব

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

প্রথা ভাঙাকে কৃতিত্বের অন্যতম লক্ষণ ভাবা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রটা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা যাই হোক না কেন। পরিবর্তনশীল বিশ্বের দেওয়াল লিখন পাঠ করে নিজেকে প্রস্তুত না করতে পারলে এই দুনিয়ায় অপ্রাসঙ্গিক হতে বাধ্য। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন। আগামী আর্থিক বছরের জন্য অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেট (২০১৭-১৮) সে কথাই বলে। বর্তমান সরকারের এই চতুর্থ বাজেটের পূর্ববর্তী বাজেটগুলিতে অর্থমন্ত্রী শ্রীঅরুণ জেটলি জল মেপেছিলেন বলা যায়।

নানা দিক দিয়েই বর্তমান বাজেট অভিনব। এছাড়াও কোনো বিভেদ থাকল না পরিকল্পিত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচের মধ্যে। এটিকে পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তির অন্যতম প্রতিফলন বলে ভাবা যেতে পারে।

বিমুদ্রাকরণের মতো সাহসী ও ঝুঁকিবহুল সিদ্ধান্তের পর উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাজেটের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি ছিল সজাগ।

বর্তমান বাজেটের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে যেটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো রাজস্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ঘাটতিকে পূর্ববর্তী বছরের জাতীয় আয়ের চার শতাংশ থেকে নামিয়ে তিন শতাংশে আনা। বিকাশ ও সমতার মধ্যে এক ভারসাম্য অর্থমন্ত্রীর ভাষণে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে। উচ্চবিত্তদের আয়ের উপর বোঝা বাড়িয়ে নিম্নবিত্তদের করের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশে নামানোয় সৎ করদাতাদের মুখে হাসি ফুটতে বাধ্য। তিন লক্ষ টাকার বেশি কোনো নগদ লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়াটাও সমর্থন যোগ্য। হাসপাতালে শিশুর জন্ম হলে প্রসূতি পিছু ছ' হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা হওয়াও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারের ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদেশি বিনিয়োগ বিকাশ পর্ষদের মতো শ্বেতহস্তীর বিলয় ঘটানো পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগ গঠনের মতোই যথাযথ সিদ্ধান্ত।

এমনই আর একটি সিদ্ধান্ত হলো রেল সংক্রান্ত IRCTC, IFFC, IRCON-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্টক মার্কেটের তালিকাভুক্ত করা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ৭২৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও রেখেছে কেন্দ্র।

- প্রথমত, বাজেট পেশের দিন একমাস এগিয়ে এল।
- দ্বিতীয়ত, ৯২ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলো।
- তৃতীয়ত, বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই পেশ করা হলো ইকোনমিক সার্ভে।
- চতুর্থত, সফট কপিতে পরিবেশিত হলো সমগ্র প্রতিবেদনটি।

লোকসানের খাদের কিনারা থেকে তুলে আনতে ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যে নতুন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম চালু করে রেলকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন জেটলি।

নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে এই বাজেটের অন্যতম চমক হলো রাজনৈতিক অনুদান গ্রহণের সীমারেখা কুড়ি হাজার থেকে নগদ দু'হাজার টাকা করা। এর বেশি দিতে গেলেই চেকে দিতে হবে। যদিও এর কার্যকারিতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়। সর্বনিম্ন সীমা বাঁধলেও সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা বেশি জরুরি ছিল। কারণ কতজন লোক ২০০০ টাকা দিতে পারবে বলা নেই। তুলনায় নয়া চমক বলা যেতে পারে নির্বাচনী বন্ডের ব্যবস্থাটিকে। অর্থমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যাঙ্ক থেকে চেক বা ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ড কিনে তা নির্দিষ্ট দলকে দেওয়া যাবে। যে দলের আয়ের ৬৫ শতাংশ বা ২ হাজার ১২৫ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা এসেছে অজানা সূত্র থেকে সেই দল পরিচালিত সরকারের উদ্যোগে এহেন সিদ্ধান্ত অবশ্যই উল্লেখ্য। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অর্থনৈতিক নীতি জাড্যের ফলে দেশের অর্থনীতিতে কালোটাকা ও সেই সংক্রান্ত দুর্নীতি যেভাবে দেশকে বদ্ধ জলায় পরিণত করেছে সেখানে অর্থনীতিতে বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাহসী পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়েছে। নোটবন্দি যদি সে পথে একটি পদক্ষেপ হয়ে থাকে এই বাজেট তারই অনুসারী বলা যায়। যেটা লক্ষণীয় তাহলো বিশ্ববিখ্যাত থেকে শুরু করে স্থানীয় পণ্ডিতরা দ্রুত সরকারি পদক্ষেপের বিরোধিতায় মুখর হলেও বর্তমান বাজেটকে নস্যাৎ করতে সময় নিচ্ছেন। দু'দিনের জন্য সংসদ বয়কট বা সরস্বতী পুজোর দিন বাজেট পেশ জনিত স্থূল উদ্ভট যুক্তি এক্ষেত্রে অর্থহীন হতে বাধ্য।

চীনের বিজয় মাল্য লাই চ্যাংশিনকে 'মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না' এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কানাডা থেকে চীন সরকার দেশে এনেছে। আট লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে চ্যাংশিন অভিযুক্ত। সিগারেট থেকে রিয়েল এস্টেট বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ-সাম্রাজ্য বিস্তৃত। বিদেশে পাঠানো কালোটাকা না হোক বিজয় মাল্যদের চ্যাংশিনের মতো দেশে আনার সম্ভাবনা বর্তমান বাজেট সুনিশ্চিত করতে পারলে আমাদের অর্থনীতি সন্দেহ নেই পুষ্টি পাবে।

(লেখক : আই এস আই-এর অধ্যাপক)

রাজনৈতিক দলের চাঁদায় কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭-১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেটে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো, রাজনৈতিক দলগুলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২০০০ টাকার বেশি নগদে চাঁদা নিতে পারবে না। এর বেশি নিতে হলে চেকে বা ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে নিতে হবে এবং দাতার নাম বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে জানাতে হবে। প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এতকাল এদেশে রাজনৈতিক তহবিল তৈরির নামে কালোটাকার পাহাড় বানানোই ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর রীতি। এই প্রথম কোনো সরকার সেই রীতির রাশ টানতে উদ্যোগ নিল। রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এরকম উদ্যোগ ভারতবাসী যে প্রত্যক্ষ করেনি সেকথা বলাই বাহুল্য।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫— এই সময়কালে ভারতের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং বিজেপির মোট আয়ের ৬৯ শতাংশ এসেছে অজানা উৎস থেকে। যার পরিমাণ ৭৮৩৩ কোটি টাকা। দিল্লিকেন্দ্রিক অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই সময়কালে দেশের আঞ্চলিক দলগুলোর আয় ৩৫৩৪.৩৭ কোটি টাকা। দাতার পরিচয়-সহ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের আয়ের মাত্র ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ১৮৩৫.৬৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে এই সময়কালে। অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী এই চাঁদার পরিমাণ ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৬৯৮.৭৩ কোটি টাকা। এডিআর-এর বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে গত ১১ বছরে কংগ্রেসের মোট আয়ের ৮৩ শতাংশ (৩৩২৩.৩৯ কোটি টাকা) এসেছে অজানা উৎস থেকে। বিজেপির সংগ্রহ ২১২৫.৯১ কোটি টাকা। আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে সমাজবাদী পার্টির মোট আয়ের ৯৪ শতাংশের (৭৬৬.২৭ কোটি টাকা) উৎস রীতিমতো ধোঁয়াটে। একই কথা প্রযোজ্য শিরোমণি অকালি দলের ক্ষেত্রে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ —এই সময়কালে জাতীয় দলগুলির অজানা উৎস

থেকে উপার্জন ৩১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪.১৩ কোটি টাকা থেকে ১১৩০.৯২ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে আঞ্চলিক দলগুলির বৃদ্ধি ৬৫২ শতাংশ (৩৭.৩৯৩ কোটি টাকা থেকে ২৮১.০১ কোটি টাকা)। তবে সবথেকে মজার তথ্য মিলেছে বহুজন সমাজ পার্টির কাছ থেকে। মায়াবতীর দল গত এগারো বছরে যত অর্থ সংগ্রহ করেছে, কোনো ক্ষেত্রেই দাতার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অর্থাৎ এই দলের ১০০ শতাংশ আয়ই এসেছে অজানা উৎস থেকে।

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। আমাদের সকলেরই মনে আছে কিছুদিন আগে আপ ভল্যানটিয়ার অ্যাকশন মঞ্চ আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছিল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, আম আদমি পার্টি এমন চারটি কোম্পানির কাছ থেকে ২ কোটি টাকা অনুদান গ্রহণ করেছিল যাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। এইভাবে টাকা নেওয়ার অর্থ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ করে দেওয়া, যা ভারতের মানি লন্ডারিং আইনের পরিপন্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে আইনি নির্দেশটা ঠিক কী একটু বুঝে নেওয়া দরকার। জনপ্রতিনিধি আইন ১৯৫১-র ২৯-বি ধারা অনুযায়ী ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কাছ থেকে চাঁদা বা অনুদান সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু ওই ধারাতেই বলা হয়েছে, বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নেওয়া যাবে না। সরকারি অর্থে (সামগ্রিক বা আংশিক) পরিচালিত কোনো সংস্থাও চাঁদা দিতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তিন বছরের কম বয়েসি সংস্থার ওপরেও। চাঁদা বা অনুদানের পরিমাণ কখনওই সংস্থার গড় লাভের ৫ শতাংশের বেশি হবে না।

এত কিছুর পরেও রাজনৈতিক দলগুলো কালোটাকার পাহাড় বানাতে সক্ষম হয়। এতদিন নিয়ম ছিল চাঁদা বা অনুদানের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা বা তার থেকে কম হলে উৎসের নাম জানানো বাধ্যতামূলক নয়। এবারের বাজেটে ন্যূনতম সীমা ২০,০০০ থেকে কমিয়ে ২,০০০ টাকা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেছেন এই প্রস্তাব কার্যকর করা হলে অস্তিত্বহীন ভৌতিক সংস্থার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। আবার কারও ধারণা এর ফলে বিদেশি টাকা আসা বেড়ে যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিলে সেই টাকা আয়কর আইন ১৯৬১-র ৮০ জিজিবি এবং ৮০ জিজিসি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়। আবার একই সঙ্গে কালোটাকা সাদাও হয়ে যায়। এতকাল এই সুযোগই নিয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত একাধিক সংস্থা।

সরকারি বাজেট প্রস্তাবের ফল শেষপর্যন্ত কী হবে তা সময়ই বলতে পারবে। তবে একটা কথা এখনই বলা যেতে পারে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কাজ নরেন্দ্র মোদী ভালোই শুরু করেছেন। তিনি জানেন রাজনৈতিক দলের তহবিল গঠনের প্রক্রিয়ার সংস্কার করলে তাঁর নিজের দল বিজেপিরও সমস্যা হবে। কিন্তু তাঁর কাছে আগে দেশ, তারপর দল। সুতরাং দেশের কল্যাণের পথে যাই বাধাস্বরূপ হয়ে উঠুক, যোগ্য সংস্কারকের মতোই তিনি তাকে মুছে ফেলবেন। ■

সুপরিকল্পিতভাবে পালটে ফেলা হচ্ছে জম্মুর জনবিন্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জনবিন্যাসগত ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে জম্মুতে। এবং সেটা পরিকল্পিতভাবেই। জম্মু প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত জায়গা। ১৯৮১ সালের গণনায় দু'টি মাত্র মুসলমান প্রধান এলাকার সন্ধান মিলেছিল জম্মুতে। ১৯৮৬-৮৭ সালের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জম্মুর হিন্দু অধিবাসী ৮৮.৫ শতাংশ, মুসলমান ৪.৫ শতাংশ, শিখ ৬.৪ শতাংশ এবং অন্যান্য ৬ শতাংশ ছিল। অশান্ত পরিস্থিতিতে ১৯৯১ ও ২০০১ সালের জনগণনা এখানে করা সম্ভব হয়নি। ২০১১ সালের জনগণনায় কিন্তু উঠে এসেছে চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান। হিন্দুর সংখ্যা দশ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৭৮.৩৬ শতাংশ, মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে ছয় শতাংশেরও বেশি— ১০.৯৭ শতাংশ। তবে আশার কথা, শিখদের সংখ্যাও কিছুটা বেড়ে হয়েছে ৮.৭৪ শতাংশ।

এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, এই পরিসংখ্যান কেবল মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। বরং এর পেছনে দীর্ঘদিনের নিঁখুত চক্রান্ত কাজ করছে। আটের দশকের শেষে কাশ্মীরে যখন জঙ্গি কার্যকলাপ চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছয় এবং নয়ের দশকের গোড়ায় তা যখন ডোডা জেলা ও রাজৌরি-পুঞ্চে গিয়ে আঘাত করে, তখন জম্মুতে হিন্দু পরিবারগুলোর অভিবাসন শুরু হয়। অন্যদিকে, জঙ্গি-প্রবণ এলাকাগুলিতে শুরু হয় মুসলমান পরিবারগুলোর অভিবাসন। আন্তর্জাতিক সীমানা এবং জম্মুকে ঘিরে বড়ো সংখ্যায় গুজ্জররা আচমকাই এসে বাস করতে থাকেন। পারিপার্শ্বিক সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে এরপরই পরিকল্পনা নেওয়া হয় জম্মুর জনবিন্যাসের ভারসাম্য দ্রুত পাল্টে ফেলার। মুসলমানেরা বৃহত্তর জম্মুর বিভিন্ন এলাকায় জায়গা জমি কিনতে থাকে এবং অন্যান্যভাবেও সম্পত্তি বৃদ্ধি করে এবং সরকারি মদতে বনাঞ্চল এমনকী সরকারি জমিও এদের একাংশের দখলে চলে যায়।

গত দেড় দশকে ব্যাঙের ছাতার মতো মুসলমান মহল্লা গজিয়ে উঠেছে জম্মুতে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খবরের কাগজে এমন বিজ্ঞাপনও দিয়েছে যে এখানকার জমি যেন শুধু মুসলমানদেরই বিক্রি করা হয়। এইসব বেআইনি কলোনিগুলিতে সরকারি পয়সায় জল বিদ্যুৎ-সহ সবরকমের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে হিন্দু অধ্যুষিত জম্মুকে ঘিরে ফেলার জন্যই

রাজ্যে রাজ্যে

এধরনের মুসলমান কলোনিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। সারা দেশে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার যেখানে ১৮ শতাংশের কাছাকাছি, সেখানে জম্মুতে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। একদিকে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়ে জম্মুতে আশ্রয় নিচ্ছেন এবং এখন জম্মুতেও মুসলমানদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে হিন্দুদের জম্মু থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। আর কাশ্মীরের মতোই জম্মুর জমি দখল করে নিচ্ছে মুসলমানরা। এই কাশ্মীরি মুসলমানদের পরিকল্পনা হলো এরা গরমের সময় কাশ্মীর উপত্যকায় থাকবে আর শীত পড়লেই নেমে আসবে জম্মুর সমতলে। অনেকে আবার কাশ্মীরে জঙ্গি উপদ্রবের কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও নিজেদের অন্যান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা করেও জম্মুতেই ঘাঁটি গাড়তে অধিক পছন্দ করছে।

উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে বিভিন্ন কারণে কাশ্মীরকে অশান্ত করতে ছক করেছে তার মধ্যে এটিও একটি কারণ যাতে স্থিতাবস্থার কারণে কিছু মুসলমান জম্মুতে গিয়ে স্থায়ী আস্থানা গড়তে বাধ্য হয়। আজ বনাঞ্চল পর্যন্ত দখল হয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর রাজনীতিক, আমলা, পুলিশ আধিকারিক ও সরকারি কর্মী এসব জায়গার ওপর তাদের প্রভূত সম্পত্তি গড়ে তুলতে পারছে। সরকারের খাজনা বিভাগের একশ্রেণীর অসাধু কর্মী ও আধিকারিকের জন্য শুধু যে জাতীয় সড়কের ধারে এবং বৃহত্তর জম্মুর সরকারি জমি মুসলমানদের হাতে চলে যাচ্ছে তাই নয় শুল্ক বিভাগের রেকর্ডও পাল্টে ফেলা হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মুসলমান উপজাতিদের বড়ো অংশের হাতে জম্মুর বনাঞ্চলের দখলদারি শুধু ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য থেকেই জম্মুকে বঞ্চিত করছে না, রাজ্যবাসীর নিরাপত্তাকেও সঙ্কটের আবর্তে ফেলে দিয়েছে।

এধরনের কাজে হুরিয়ত এবং আই এস আই-এর কাছ থেকে টাকা আসার খবরও মিলতে শুরু করেছে। এদের আর্থিক মদতে মুসলমানরা দখলদারির বাইরে হিন্দুদের কাছ

> **নেহরুর ভুলের খেসারত দিয়ে কাশ্মীরের একাংশ যেভাবে এখনও পাক-অধিকৃত এবং ভারতে এখনও যেটুকু আছে, তাকে যেভাবে অশান্ত করা হচ্ছে, ঠিক একই কায়দায় কাশ্মীরের সঙ্গে সঙ্গে জম্মুকেও অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পাকিস্তানকে সুবিধা করে দিতে চাইছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।**

জম্মুর জনগণনা			
জনগণনার বছর	হিন্দু	মুসলমান	শিখ
১৯৮১	৮৮.৫	৪.৫	৬.৪
২০১১	৭৮.৩৬	১০.৯৭	৮.৭৪

থেকে কখনও কখনও বাজার দরের বেশিতে গিয়েও জমি সম্পত্তি কিনে নিচ্ছে। সেই সমস্ত হিন্দু পরিবারেই এধরনের ঘটনা ঘটছে যাদের সন্তানেরা রাজ্যের বাইরে বা দেশের বাইরেও চাকরিসূত্রে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং অশান্ত জম্মু-কাশ্মীরে আর বাবা-মাকে রাখতে চাইছে না বলে জমি বেচে দিচ্ছে। আর এই কারণেই আটের দশকের গোড়ায় জম্মুতে যেখানে মাত্র দু'টি মুসলমান অধ্যুষিত কলোনি ছিল আজ সেখানে মুসলমান কলোনির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ত্রিশ ছুঁয়েছে, যা গুজ্জরদের বস্তিগুলির সমসংখ্যক। এদের মধ্যে অনেকে যেমন ভারতের নাগরিকত্ব জোগাড় করে নিতে পেরেছে রাজনীতিক-পুলিশ অসাধু আঁতাতে, তেমনি অন্যদিকে আবার অনেকেই এখনও ভারতীয় নাগরিকত্ব জোটাতে পারেনি।

এদের সংখ্যা কিন্তু ২০১১-র জনগণনায় ধরা হয়নি। প্রকৃত সংখ্যাটা এলে জনবিন্যাসের পরিবর্তনের হার কতটা বিপজ্জনক ভাবে ধরা পড়তো তা ভেবেই শিউরে উঠছেন অনেকে।

কিন্তু বাস্তব মামুলি পরিসংখ্যানের থেকেও ভয়াবহ। সরকারি বয়ানই বলছে ১৩ হাজার ৪০০ মায়ানমায়ারীয় ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঘাঁটি গেড়েছে জম্মুতে। যদিও বেসরকারি পরিসংখ্যান এর কয়েকগুণ হওয়ারই আশঙ্কা। সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ রোহিঙ্গা মুসলমানেরা। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের বাসিন্দা ছিল এরা। ১৯৮২ সালে মায়ানমার সরকার এদের সেদেশের অনাগরিক ঘোষণার পরে এরা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানেও। কিন্তু কোনো দেশের দরজাই এদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, কেরল, অসম, জম্মু-কাশ্মীর ও দিল্লিতে প্রায় ৩৬ হাজার রোহিঙ্গার বসবাস। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা যেমন রাজীব নগর কাশিম নগর, মালিক বাজার, বাহু দুর্গ, কার্গিল কলোনি, ভাতিন্ডা ইত্যাদি স্থানে প্রায় ১৭০০ রোহিঙ্গা পরিবারের ৮৫০০ সদস্যের (সরকারি হিসেবে অবশ্য ১২৫০ পরিবারের ৫০০০ সদস্যের) বাস। ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি (ইউ এন এইচ সি আর)-র নিয়মানুযায়ী এদের অধিকাংশ 'উদ্বাস্তু' তকমাপ্রাপ্ত। কিন্তু সূত্রের খবর এদের মধ্যে ১৮৫টি পরিবারের 'উদ্বাস্তু' তকমা নেই। ফলে জম্মুর গোল গুজরাল, নন্দিনী, সেওরা, টোপের মতো জায়গাগুলি অবৈধ অভিবাসীতে পূর্ণ।

পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ-কারীদের কথাও বলতে হবে। জম্মু ও তার সংলগ্ন এলাকা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে নব্বইয়ের দশক থেকেই। ২০১৬-র নভেম্বরে সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যসভায় যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতে ২ কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে এদের সংখ্যাটা ঠিক কত তা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও এই সংখ্যা দশ হাজারের কম হবে না বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান। এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এধরনের জনবিন্যাসগত পরিবর্তন জম্মু-কাশ্মীরের জন্য কী সতর্কবার্তা বয়ে আনছে?

বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও গুপ্তচরবাহিনীর মদতপুষ্ট। নেহরুর ভুলের খেসারত দিয়ে কাশ্মীরের একাংশ যেভাবে এখনও পাক-অধিকৃত এবং ভারতে এখনও যেটুকু আছে, তাকে যেভাবে অশান্ত করা হচ্ছে, ঠিক একই কায়দায় কাশ্মীরের সঙ্গে সঙ্গে জম্মুকেও অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পাকিস্তানকে সুবিধা করে দিতে চাইছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তাই হিন্দু প্রধান জম্মুর রাজনৈতিক- সামাজিক পট পরিবর্তনের জন্য আপাতত জনবিন্যাসের ভারসাম্য পরিবর্তনের চক্রান্তেই লিপ্ত পাক-মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

চোদ্দ বছরের যুদ্ধবিশারদ

হর্ষবর্ধন জালা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে পাশের বাড়ির ছেলে। বয়েস মোটে চোদ্দ। চোখে চশমা। ভালো করে নজর করলে ছেলেমানুষী সারল্যও চোখে পড়বে। কিন্তু এই ছেলের সঙ্গেই যে সাম্প্রতিক ভায়াব্র্যান্ট গুজরাটের গ্লোবাল সামিটে গুজরাট

নিজের নির্মীয়মান ড্রোন-এর সঙ্গে হর্ষবর্ধন জালা।

সরকার ৫ কোটি টাকার মউ চুক্তি সাক্ষর করেছে। কারণটা বললে অনেকেই আঁতকে উঠবেন। ছেলেটিরই ডিজাইন করা ড্রোন তৈরি করার জন্য গুজরাট সরকার এই চুক্তি করেছে।

ড্রোন কী বস্তু আজকাল অনেকেই খবর রাখেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ড্রোন এক ধরনের চালকহীন আকাশযান। প্রযুক্তির দুনিয়ায় একে বলা হয় আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল বা ইউ এ ভি। অনেকে ফ্লাইং রোবটও বলে থাকেন। এই ধরনের আকাশযান রিমোটের মাধ্যমে চালানো যায়, আবার সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত জিপিএস এবং সেন্সরের মাধ্যমেও চালানো যায়। ড্রোনের ব্যবহার মূলত সেনাবাহিনীতেই সীমাবদ্ধ। অ্যান্টি এয়ারক্রাফট টার্গেট প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে অস্ত্রশস্ত্র বহন করার কাজেও ড্রোন ব্যবহার করা হয়। তবে আজকাল অসামরিক ক্ষেত্রেও ড্রোনের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু যে-ছেলেটির কথা দিয়ে এই নিবন্ধের শুরু তার উদ্দেশ্য ড্রোনের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীদের বিছিয়ে রাখা ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা। সেইজন্যেই গুজরাট সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক তার সঙ্গে চুক্তি করেছে।

যাই হোক, ছেলেটির নাম হর্ষবর্ধন জালা। যে বয়েসে ছেলেমেয়েরা বোর্ডের পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়, সেই বয়েসে সে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম ড্রোনের তিনটি প্রোটোটাইপ বানিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনাও তার তৈরি। হর্ষবর্ধনের কথায়, ‘অনেকদিন আগে টিভিতে সেনাবাহিনীর কয়েকজনকে খালি হাতে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে মারাত্মক আহত হতে দেখেছিলাম। সেদিনই ড্রোন তৈরি করার আইডিয়া প্রথম মাথায় আসে।’

তিনটি প্রোটোটাইপ বানাতে হর্ষবর্ধনের ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। প্রথম দুটির জন্য ২ লক্ষ এবং তৃতীয়টির জন্য ৩ লক্ষ। গ্লোবাল সামিটে সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে হর্ষবর্ধন জানিয়েছে তার তৈরি ড্রোন ল্যান্ডমাইন খুঁজে বের করে তাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। ড্রোনে রয়েছে ইনফ্রারেড আরজিবি সেন্সর এবং থার্মাল মিটার। সেই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় শাটার সহ একটি ২১ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যা হাই রেজলিউশনের ছবি তুলতে সক্ষম। আরও জানা গেছে, হর্ষবর্ধনের ড্রোন চারিদিকের আট স্কোয়্যার মিটার অঞ্চল জুড়ে তরঙ্গ পাঠাতে পারে এবং ওই অঞ্চলে বিছিয়ে রাখা যাবতীয় ল্যান্ডমাইন তরঙ্গের আঘাতে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। এছাড়া ড্রোনটি সর্বোচ্চ ৫০ গ্রাম ওজনের একটি বোমা বহনেও সক্ষম। আপাতত হর্ষবর্ধনের লক্ষ্য আরও বেশি সংখ্যায় ড্রোন তৈরি করে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির ব্যবহারের জন্য তুলে দেওয়া। ইতিমধ্যেই সে পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছে। ড্রোন তৈরির ব্যবসায়িক দিকটি দেখাশোনা করার জন্য হর্ষবর্ধন প্রতিষ্ঠা করেছে তার নিজের কোম্পানির। নাম অ্যারোবোটিকস। চোদ্দ বছরের কিশোরের এহেন দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিন্তু বিস্ময়ের আদৌ কিছু আছে কিনা, তা হর্ষবর্ধনকে দেখে বোঝার উপায় নেই। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, ‘আগে আমি খেলার ছলে ড্রোন বানাতাম। পরে বুঝেছি আমায় লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তাই ল্যান্ডমাইন বেছে নিয়েছি। আমার আরও অনেক পরিকল্পনা আছে। পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে সেইসব নিয়ে কাজ করব।’ হর্ষবর্ধনের বাবা প্রদ্যুম্ন সিংহ জালা নরোদার একটি প্লাস্টিক উৎপাদক কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মা গৃহবধূ। দু'জনেই ছেলেকে নিয়ে খুশি। সম্প্রতি বিখ্যাত বহুজাতিক গুগলের আমেরিকান হেডকোয়ার্টারে হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ সেই খুশিকে বহুগুণে বর্ধিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

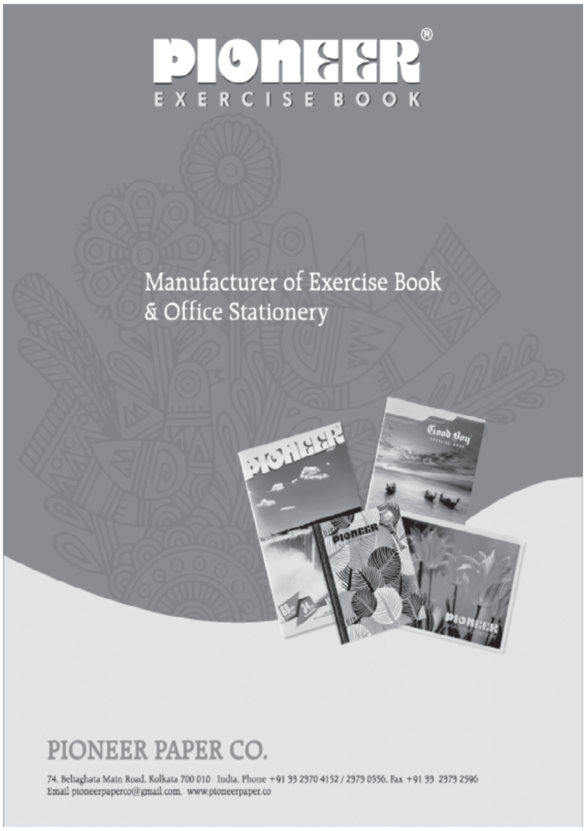

"যদি তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) জন্মগ্রহণ না করতেন তবে যে বেদ-বেদান্ত আজ সহস্র মানুষের কাছে জীবনধারণের উপাদান বিতরণ করছে, হয়তো তা পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য বাদানুবাদমাত্রে পরিগণিত হত। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আধিকারিক পুরুষের মতো শিক্ষা দিয়েছেন, তথাকথিত পণ্ডিতদের মতো নয়। যে তত্ত্ব উপদেশ করেছেন, নিজে তিনি সেই অনুভূতির গভীরে নিমগ্ন হয়েছেন এবং শ্রীরামানুজের মতো ফিরে এসেছেন পারিয়া, জাতিচ্যুত এবং বিদেশীদের কাছে সে গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বের তথ্যানুসন্ধান

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহস্রাধিক পাতায় লেখক তাঁর সুবিশাল গ্রন্থে ১৯৪০-এর দশকে ভারতের ভাগ্যানুসন্ধানের বিষাদব্যঞ্জক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক পেশাদার ঐতিহাসিক নন। একজন সরকারি আধিকারিকের কর্মজীবনের ফাঁকে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্ব নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছেন। এই পর্বের ইতিহাস নিয়ে তথ্যের সীমা পরিসীমা নেই। সরকারি নথিপত্র ছাড়া সংবাদপত্র, আত্মকথা ও গ্রন্থ সম্ভার থেকে তথ্য চয়ন করা এক দুরূহ কাজ। এর পাশাপাশি সেই সময়ের ইতিহাসের গতিমুখকে সার্থকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন-এর নির্দেশকে তিনি শিরোধার্য করে ঘটনার অনুসন্ধান ও প্রকৃত সত্যের নির্যাস আহরণে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিহাস রচনার দুটি প্রধান উপাদান হলো তথ্য চয়ন ও ঐতিহাসিকের রচনাকৌশল। কিন্তু মনোমতো তথ্য সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক যদি নিজের পূর্ব পরিকল্পিত ধ্যানধারণাকে পরিবেশন করেন তাহলে তা প্রকৃত ইতিহাসের অপলাপ হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মধ্যে সময়ের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলাই হবে সঠিক ঐতিহাসিকের কাজ। আর একটি কথা, ইতিহাস রচনায় যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। ইতিহাস হলো কালের কথা আর মানুষের কথা। তাই কালের প্রবাহ ও যুগযন্ত্রণা ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শুধুমাত্র ঘটনার পসরা নয়। যুগের চরিত্র অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রী ভঞ্জচৌধুরী লিখেছেন তিনি সাহিত্যের ছাত্র। তাই ইতিহাস রচনার পেশাদারি অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু গিবন, কার্লাইল, মেকলের ইতিহাস গ্রন্থ পড়লে বোঝা যায় রচনাশৈলীর উৎকর্ষ কীভাবে ইতিহাসচর্চাকে মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

১৯৪০-এর দশকে ভারতের ইতিহাসে দুটি প্রবাহ সমান্তরাল খাতে বয়ে চলেছিল— একটি হলো মুক্তি অর্জনের পদধ্বনি আর অন্যটি হলো দেশভাগ ও আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের হানাহানি। আশ্চর্যের কথা হলো, মুক্তি সাধনার পরিণতি কেন গৃহবিবাদের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হলো? অর্থাৎ ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম কমেডি না হয়ে ট্রাজেডির খাতে নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু কী ধরনের ট্রাজেডি? এ কী গ্রিক ট্রাজেডি না শেকস্‌পীয়রের ট্রাজেডির ভারতীয় সংস্করণ? সত্যি বলতে কী এই বেদনামুখর ঘটনাক্রম অনিবার্য ছিল না। আবার তা ঈশ্বরের বিধান বা নিয়তির পরিহাসও নয়। রাজনীতির পাশাখেলার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজ স্বার্থে দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন। অহিংসা নীতির নির্মম পরিণতি গান্ধীজী স্বচক্ষে দেখে গেলেন। আবার তিনি চেয়েছিলেন দেশের ঐক্য ও সংহতি, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা অধরা রয়ে গেল। এই পরিণতি কি শুধুই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি? ক্ষমতার রাজনীতির মৌতাতে বিভোর দুই

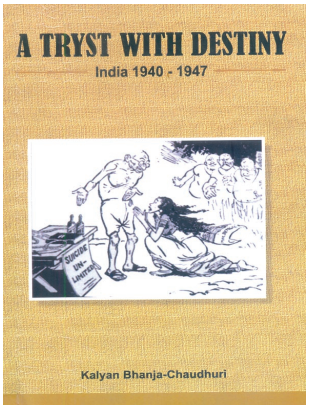

প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। পরিত্রাণের পথ ছিল কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তা বুঝতে পারেননি অথবা বুঝেও চোখ বুঁজে ছিলেন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার ক্রিপস মিশন পাঠালেন। কিন্তু কংগ্রেস ক্রিপস-প্রস্তাবে সায় দিল না। শ্রী অরবিন্দ ক্রিপস মিশনকে স্বাগত জানালেন। তাঁর মতে ক্রিপস-প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস সংঘাতের পথ বেছে নিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলে জাতীয়তাবাদী নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। আর জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তার শক্তি ও সংগঠন বাড়াতে লাগল। জিন্না নিজেকে ভারতীয় মুসলমানদের 'একমাত্র প্রতিনিধি' (The Sole Spokesman) হিসাবে জাহির করলেন। যুদ্ধের পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দর কষাকষি চালাতে লাগল। আর মূল প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ কর্তারা এই খেলায় রেফারির ভূমিকা নিলেন।

আমার ব্যক্তিগত গবেষণা সন্দর্ভ হলো বাংলার শহরকেন্দ্রিক রাজনীতির চালচিত্র (১৯৩৭-৪৭)। সেই কালপর্ব নিয়েই শ্রী ভঞ্জচৌধুরী চুলচেরা আলোচনা করেছেন। দু'খণ্ডে আধুনিক ১৮৫৮-১৯৬৪ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ) রচনার জন্য বিভিন্ন তথ্যসূত্র নাড়াচাড়া করেছি। এছাড়া স্টেট আর্কাইভস-এর অধিকর্তা থাকার সুবাদে সরকারি নথিপত্র তত্ত্বাবধানের সুযোগ পাই। স্বাভাবিক ভাবেই শ্রী ভঞ্জচৌধুরীর গ্রন্থটি পর্যালোচনার দায়িত্ব মেলায় আমি আনন্দিত হয়েছি।

শ্রী ভঞ্জ চৌধুরীর দুটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। প্রথমত, তিনি প্রথম পর্বের নরমপন্থী নামে কথিত নিয়মতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদীদের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। ভারতের মহান প্রবীণ ব্যক্তি ('The grand old man of India') নামে কথিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় দাদাভাই নওরোজী তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন (অ-ব্রিটিশ শাসন)-এর মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন এনেছে অর্থনৈতিক দুর্দশা (Economic Poverty), রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার (Political misrule) আর নৈতিক স্খলন ও অবনমন (Moral Poverty)। ভারতীয় রাজনীতির 'রত্ন' নামে বন্দিত ও গান্ধীজীর গুরু নামে পরিচিত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নিজেদের তাৎক্ষণিক ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাদের ব্যর্থতা আগামী দিনের শক্তির পূর্বাভাষ' ("We, of the present generation, must be content to serve her mainly by our failures, out of those failures the strength will come which in the end will accomplish great taskes")।

ভারতে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান ও সম্প্রীতি রক্ষা ছিল গান্ধীজীর রাজনীতির মূল সূত্র। বোধকরি তিনি জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসকদের মদতে ও মুসলিম লীগের কর্তাদের প্ররোচনায় স্বদেশি আন্দোলনের সময়েই বাংলায় মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয় (মার্চ-এপ্রিল ১৯০৭)। শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় (১ মে ১৯০৭) হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় হিন্দুদের পলায়নবাদী মনোভাবকে দায়ী করেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা পত্রিকায় লিখলেন, 'আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ ভিন্ন আর কোনো পথ নেই'। কিন্তু গান্ধীজী ইতিহাসের দেওয়াল লিখন উপলব্ধি করতে পারেননি। ১৯২০ সালের পর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের সময় খিলাফত প্রশ্নকে জুড়ে দিয়ে গান্ধীজী ভেবেছিলেন সহজেই বাজিমাত করবেন। কিন্তু আন্দোলনের সময় ও অব্যবহিত পরে ভারতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণে মোপালা হাঙ্গামা ও উত্তর-পশ্চিমে কোহাত-এ হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়। গান্ধীজী পরামর্শ দিলেন আক্রান্ত হয়েও যেন হিন্দুরা অত্যাচার সহ্য করেন। মুসলমান স্বাতন্ত্র্যবাদের পাশাপাশি দলিত বা তপশিলি জাতির মধ্যেও বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর কথা ঘোষণা করলো। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রবক্তা দেখলেন কীভাবে ভারতীয় রাজনীতি বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষবাষ্পে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠছে। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের নেতারা ও তপশিলি জাতির নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী হতে শুরু করল। লোকমান্য তিলক ও লালা লাজপত রায়ের মতো বরেণ্য নেতারা এই বিভাজন-নীতির বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

এবার প্রশ্ন হলো, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের শেষ দশক সংকটের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শ্রী ভঞ্জ চৌধুরী ১৯৪০ সাল থেকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে উপস্থাপনা করেছেন, আমার বক্তব্য হলো সময়কাল ১৯৪০ সাল থেকে না হয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করা সঙ্গত হোত। কারণ ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে ব্রিটিশ ভারতের বেশিরভাগ প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। এর ফলে মুসলিম লীগ নেতা জিন্না উপলব্ধি করলেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন অপসৃত হলে ভারতে কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং একমাত্র পথ হলো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন। ১৯৪০ সালের মার্চে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মাত্র সাত বছরের মধ্যে পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। শুধুমাত্র জিন্নার কূটকৌশলের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল তা বলা যায় না। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জিন্নার পক্ষে ঠেলে দেয়। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে সরাসরি পাকিস্তান দাবি স্বীকৃতি পায়নি। তাই জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দ্রুত ক্ষমতা লাভের আশায় বোঝাপড়ার রাস্তায় হাঁটতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভাজনের বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নিল। মাউন্ট-ব্যাটেন কংগ্রেসের আপনজন হয়ে উঠলেন।

গান্ধীজী সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে সমর্থন যোগ্য। প্রথমত, গান্ধীজী একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার মাশুল দিতে হয়েছে সমগ্র ভারতকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আপোশরফায় রাজি হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। সি. শঙ্করণ নায়ারের মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছেন ১৯২১ সালের শেষ দিকে গান্ধীজী কীভাবে বোঝাপড়ার রাস্তা বন্ধ করে দেন। এছাড়া মুসলমানদের খিলাফতের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমান আত্মপরিচয়ের সর্বনাশা প্রভাব সঞ্জীবিত করেন। ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জাতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেন। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের কাণ্ডারি হতে চাইলেন, অথচ ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনমুখী রাজনীতির বিরোধিতা করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর অহিংসা নীতি সত্যই হাস্যকর ও বিভ্রান্তিজনক। হিংসা দেখা দিলেই তিনি অনশনে বসতেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত অহিংসা তত্ত্ব অবাস্তব ও অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। আসলে সক্রিয় প্রতিরোধমূলক নীতি ভিন্ন অশুভ শক্তিকে পর্যুদস্ত করা যায় না। লোকমান্য তিলক রচিত গীতা রহস্য গ্রন্থে এই তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। ১৯২০ সালের তিলকের প্রয়াণের পর গান্ধীজী একতরফা নেতৃত্বের আসনে বসলেন। তারপর দেশবন্ধুর প্রয়াণ (১৯২৫) ও মতিলাল নেহরু'র তিরোধান (১৯৩১)-এর ফলে গান্ধীজীর কর্তৃত্ব সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। পরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির অপ্রতিহত কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে কংগ্রেসের বাইরে নিক্ষিপ্ত হলেন। আসলে গান্ধীজী চাইতেন যে তিনিই কংগ্রেস, তাঁর সমকক্ষ কেউ থাকবে না, অন্যদের নতিস্বীকার করে থাকতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে গান্ধীজী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁর শিষ্যরা যখন দিল্লিতে ক্ষমতার রাজনীতির অলিন্দে বিরাজ করছেন, সেই সময় (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) গান্ধীজী বাংলার দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দীর সঙ্গে অনশনে সময় অতিবাহিত করছিলেন।

শ্রী ভঞ্জচৌধুরী এত বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে সাবলীল ভাষায় এক জটিল সময়ের গ্রন্থিমোচন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁর লেখার মধ্যে দুটি বিষয় বিশেষভাবে তারিফ করা যায়। একটি হলো মহাত্মা গান্ধীর নৈতিকতা ও অহিংসার মুখোশের আড়ালে স্ববিরোধী অবস্থান। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁকে 'ভণ্ড' বলতেও দ্বিধা করেননি। দ্বিতীয়ত, লেখক নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা দেশের জন্য আত্মবলিদান করেননি, কিন্তু তাঁদের জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল ইতিবাচক ও বাস্তববাদী। তাই ১৯১৭ সালে ভারতে শাসন সংস্কারের যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাই ধাপে ধাপে ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন, ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন ও ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আইনে বাস্তবায়িত হয়। দাদাভাই নওরোজী থেকে গোখলে, সপ্রু, জয়াকর, শ্রী নিবাস শাস্ত্রীর সৃজনশীল ভূমিকা কী সঠিকভাবে পর্যালোচনার সময় আসেনি?

A Tryst with Destiny India : 1940-1947. লেখক : কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী। প্রকাশক : গ্রন্থকার। মূল্য : ১২০০। প্রাপ্তিস্থান : সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কলকাতা-৭০০০৭৩।

(লেখক স্টেট আর্কাইভের প্রাক্তন অধিকর্তা)

সমাবেশ সমাচার

শিলিগুড়িতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কার্যালয় ও শ্রীশ্যাম ক্রীড়া ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি নিকটস্থ শালবাড়ির বীরসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিসরে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গ প্রাদেশিক কার্যালয় ও শ্রীশ্যাম ক্রীড়া ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শ্রীদীপক মানসিংহকা'র মাতৃদেবী শ্রীমতী দেবকী দেবী মানসিংহকা।

উদ্বোধনের পরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে উত্তরবঙ্গে কল্যাণ আশ্রমের সতত সক্রিয় কার্যকর্তা গোপীকৃষ্ণ আগরওয়ালকে বিশেষভাবে সম্মান ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁকে শাল দিয়ে সম্মানিত করেন সর্বভারতীয় সহ সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণুকান্তজী। ক্রীড়া ছাত্রাবাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রমুখ শক্তিপদ ঠাকুর। ছাত্রবাস পরিচালনার জন্য তিনি সমাজের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিষ্ণুকান্তজী। শেষে ধন্যবাদ জানান কল্যাণ আশ্রমের উত্তরঙ্গ শাখার সভাপতি সুশীল বেরেনিয়া।

পরলোকে অধীর দাস

গত ২৯ জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকা পত্রিকা প্রচার প্রতিনিধি অধীর দাস রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি মা, স্ত্রী, ১ দাদা, ২ বোন, ৪ বছরের পুত্র এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি গঙ্গারামপুর থানার সুতইল গ্রামের স্বয়ংসেবক। ১৯৭৭ সালে স্বয়ংসেবক হন। মুখ্যশিক্ষক, খণ্ড কার্যবাহ, মহকুমা শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ৮০-র দশকে বালুরঘাট কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে হিলি থানার ত্রিমোহিণীতে সঙ্ঘের বিস্তারক হিসেবে এলাকায় শাখা বিস্তারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। গত কয়েক বছর ধরে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করছিলেন। ব্যস্তময় কর্মজীবনের মধ্যে তাঁর প্রেরণায় এলাকায় তিনটি সরস্বতী শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর অকাল প্রয়াণে সবার সঙ্গে স্বস্তিকার পরিবারও গভীরভাবে মর্মাহত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা— তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

বহরমপুরে অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

গত ৫ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে গোরাবাজার সরস্বতী শিশু মন্দিরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় নাম নথিভুক্ত করণের পর শিক্ষক সম্মেলন শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন দুর্গাদাস রায়চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। মুখ্যবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলোক চট্টোপাধ্যায় এবং বহরমপুর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুদীপ্ত সিংহ।

ভারতমাতা পূজা, বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ ও রক্তদান শিবির

গত ২৯ জানুয়ারি সেবা ভারতীর পরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহযোগিতায় বারুইপুরে অনুষ্ঠিত হয় ভারতমাতা পূজা, বিশ্ব শান্তিযজ্ঞ ও রক্তদান শিবির। এদিন ৪ জন মহিলাসহ ৪২ রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার সম্পাদক অজিত বসু, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালি ও বারুইপুর নগর সঙ্ঘচালক ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের কার্যকারী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাস, সদস্য কমল চ্যাটার্জী ও শঙ্করলাল সরকার। শ্রী সরকার ও বিশ্বাস রক্তদানে সকলকে উৎসাহিত করেন এবং অন্যান্য প্রকল্পের উল্লেখ করে সমাজের সকলকে সেবা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সমাজের সকল দুঃস্থ, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে এনে সমাজকে সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে সহভোজে ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

With Best Compliments from -

A

Well

Wisher

(S. Kundu)

‘স্মরণিক’-এর ‘নটী বিনোদিনী’ এক অন্য অভিজ্ঞতা

বিকাশ ভট্টাচার্য

নটী বিনোদিনীকে নিয়ে অনেক নাটক হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও অভিনীত ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালাটি। তারও বহু আগে ষাটের দশকে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ সম্পূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ এবং আবেগ-বহির্ভূত একটি নাটক লিখেছিলেন যেটি নান্দীকার অভিনয় করত। বিনোদিনীর ভূমিকায় মঞ্জু ভট্টাচার্য ও পরে কেয়া চক্রবর্তী অভিনয় করেছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য আকাডেমি আয়োজিত ষোড়শ নাট্যমেলায় বেঙ্গালুরুর নাট্যদল স্মরণিক রজত ঘোষ রচিত নটী বিনোদিনী অভিনয় করে গেল যেখানে বিনোদিনীকে একটু অন্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রজত ঘোষ মূলত হাসির নাটক লিখেই পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর ‘পেটচুরি’, ‘বিধুদা’, ‘হেলমেট’ হাসির নাটক। কিন্তু নটী বিনোদিনীতে আমরা অন্য রজত ঘোষকে খুঁজে পাই। বিনোদিনীকে অধিকাংশ নাটকেই তাঁর প্রতি অবিচারে চোখের জলে ভাসতে দেখেছি। যে বিনোদিনীকে গুর্মুখ রায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে তার টাকায় থিয়েটার বাড়ি তৈরি হলো, কথা ছিল ওই মঞ্চ হবে বিনোদিনীর নামে। মঞ্চ তৈরির সময় বিনোদিনী ঝুড়িতে করে ইটও বয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাম হয় স্টার থিয়েটার। বিনোদিনীর প্রতি এই বঞ্চনায় দর্শককুল চোখের জলে ভেসেছে। রজত ঘোষ কিন্তু এখানে বিনোদিনীর চোখে দিয়েছেন প্রতিবাদের আগুন। গিরিশ-অমৃতলাল-দাশু নিয়োগীর ভেতরের

জমে থাকা অন্ধকারকে এ নাটকে টেনে বের করা হয়েছে। বিরাট অভিনেতা, আদর্শ শিক্ষক অথচ মানুষ হিসেবে যেন বড়ই সাধারণ। তাঁর কাছে অভিনেত্রী বিনোদিনীর চেয়েও যেন বড় হয়ে উঠেছে বারবণিতা বিনোদিনী। যার বাড়িতে স-পারিষদ মদ্যপানের আসর বসানো যায় কিন্তু শত আবেদনেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও অন্নগ্রহণ করা যায় না। বিনোদিনীর বিস্ময়কর অভিনয় ক্ষমতা, থিয়েটারের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, সমর্পণ সব যেন গিরিশের কাছে মূল্যহীন। শেষদৃশ্যে গিরিশচন্দ্রকে বিনোদিনীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো—এই বিনোদিনীকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। গুরু গিরিশচন্দ্রের মধ্যে কতটা অসহায়তা ও আত্মধিক্কার সেদিন এসেছিল জানা নেই, কিন্তু প্রিয় শিষ্যার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সামনে তিনি সেদিন মুখ লুকোবার জায়গা পাননি।

নাটকটির নির্দেশক ও গিরিশচন্দ্রের ভূমিকাভিনেতা সায়নদেব ভট্টাচার্য বয়সে তরুণ হলেও ভাবনায় বেশ পরিণত। ইনি আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা-নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্যের পুত্র। কর্মসূত্র বেঙ্গালুরুতে আছেন। তাঁরই মতো আর কয়েকজনকে একত্রিত করে কাজের ফাঁকে নাট্যচর্চা করছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যদিও তাঁদের সবটুকুই দিয়েছেন। তবু এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। বিনোদিনীর ভূমিকায় প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, গুর্মুখ রায় রাজশেখর ভট্টাচার্য, অমৃতলাল সৌম্যজিৎ ঘোষ এবং রামকৃষ্ণের ভূমিকায় দীপঙ্কর ব্যানার্জী যথাযথ। যত অভিনয় হবে এঁদের অভিনয় আরও ভালো হবে নিশ্চয়ই। এঁরা প্রবাসী বাঙালি। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের মতো নিয়মিত নাট্যচর্চা করার এঁরা কতটা সুযোগ পান জানা নেই। তবে প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।

সঙ্গীতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এ নাটকে। এ ব্যাপারে মুরারী রায়চৌধুরী প্রশংসনীয়। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আলোর সঙ্গে কোহিনূর সেনবরাটের নৃত্যের ঐকতান মুগ্ধ করে। পরিশেষে নাট্যকার রজত ঘোষের কাছে একটা বিনীত প্রশ্ন। আপাতদৃষ্টিতে বিনোদিনীর প্রতি গিরিশের ব্যবহার যতই সমালোচনার যোগ্য হোক না কেন—সেদিনের সমাজ, সমাজের অনুশাসন ও ভ্রূকুটির কথা মনে রেখে, সর্বোপরি থিয়েটারের স্বার্থে, স্থায়ী মঞ্চের প্রয়োজনে সেদিন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র যা করতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন তার জন্য কি তিনি এতটা নির্মম সমালোচনা পেতে পারেন? ■

ভ্রম সংশোধন

গত ৩০ জানুয়ারি স্বস্তিকায় ‘রঙ্গম’ বিভাগে বিকাশ ভট্টাচার্যের ‘শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি মরমি সঙ্গীতশিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তী’ লেখায় ভুলবশত সুধীরলাল চক্রবর্তীর ছবির স্থানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছবি ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —সম্পাদক।

শব্দরূপ-৮২২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

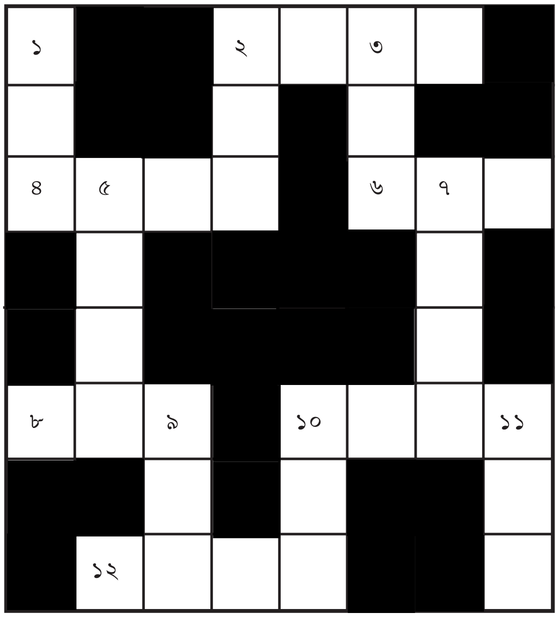

সূত্র :

পাশাপাশি : **২.** শিবাজীর রাজ্যাভিষেক এই দুর্গে, **৪.** হলদে, পীত, **৬.** 'এসেছে —, হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে', **৮.** জলে দেবপ্রতিমা বিসর্জন, **১০.** শুভজনক, **১২.** যোগ প্রণেতা ঋষি।

উপর-নীচ : **১.** বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, **২.** গর্দভ, **৩.** বিনায়ক, লম্বোদর, **৫.** রমণেচ্ছা, কাম, **৭.** বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তিলক বিশেষ, **৯.** বড় বাতাসা, **১০.** ইন্দ্রের সারথি, **১১.** চণ্ডিকা; অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৯

		রা	ম	লী	লা		প
ত	র	জা			দা		রি
	ক্ত		বে		বি	শা	খা
	ক	পি	লা			প	
	র			ধা	স্টা	মো	
ক	বী	র		রা		চ	
ব		সা			ম	ন	সা
ন্ধ		ল	ম্বো	দ	র		

সঠিক উত্তরদাতা

দীপক রঞ্জন দাস
জোড়াঘাট লেন, চুঁচুড়া, হুগলী
ভক্তিপদ সেন
ঝালদা, পুরুলিয়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৮২২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ মার্চ ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২১

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

মাইনাস ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হিমাচল প্রদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে কার্যকর্তা নির্মাণের জন্য শিক্ষাবর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরকম বর্গের মাধ্যমেই দেশ ও সমাজের কাজ করার জন্য দেশভক্ত, অনুশাসিত, চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ কার্যকর্তা নির্মাণ হয়। তাই দেশের ডাকে যে-কোনো সময় যে-কোনো পরিস্থিতিতে কার্যকর্তারা হাসিমুখে এগিয়ে যান। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, দিল্লিতে ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায় যেমন এই শিক্ষাবর্গ হয়, তেমনি হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রাতেও হয়। এবছর ৮ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০ দিনের শিক্ষাবর্গ হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম বর্ষে এই সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে ১৬ থেকে ৪০ বছর বয়সের ২০৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। হিমাচল প্রদেশের ১৫০টি স্থান থেকে তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া ২০ জন শিক্ষক এবং ৪০ জন প্রবন্ধক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, কৃষক ও ব্যবসায়ী সব শ্রেণীর ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার এ দৃশ্য দেখার পর অনেকের মন্তব্য : ৯০ বছরের বিরোধিতা সত্ত্বেও এজন্যই সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে।

সংস্কৃতে ধারাবিবরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী সংস্কৃতে! লাউড স্পিকারে ধারাভাষ্যকারের গলা গমগম করছে। শোনা যাচ্ছে, 'এতে ক্রিকিদ : ছাত্রঃ দণ্ডচলানার্থম্ অগমিষ্যন্তি।' অর্থাৎ একজন ছাত্র ব্যাট হাতে মাঠে নামছে। কিছুক্ষণ পর ধারাভাষ্যকার বললেন, 'এতে ছাত্র ঃ কন্দুক ক্রীড়ানার্থম্ অগমিষ্যন্তি।' অর্থাৎ আরও একজন বল করার জন্য এগিয়ে এল। ঘটনাটা অভিনব হলেও বাস্তব। বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি (এস এস ইউ) অনুমোদিত শাস্ত্রার্থ মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার-কলেজিয়েট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা ভারতের চিরাচরিত পোশাক ধুতি-কুর্তা পরে খেলতে নেমেছিলেন। খেলা ছিল সরস্বতী পুজোর দিন। সংস্কৃত যে শুধুমাত্র পণ্ডিতের ভাষা নয়, দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজন যে সংস্কৃত পূরণ করতে সক্ষম এমন একটি অভিনব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কাশী বিদ্যামন্দির সংস্কৃত ডিগ্রি কলেজ, ইন্টারন্যাশনাল চন্দ্রমৌলী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, রণবীর সংস্কৃত কলেজ এবং শাস্ত্রার্থ মহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠে। প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফি খেলোয়াড় ধীরাজ মিশ্র এবং রাজ্যদলের সদস্য সঞ্জীব তেওয়ারি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেন।

জোর করে সন্তানের দখল বেআইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে বাবা-মা যাতে তার ওপর জোরজবরদস্তি না করতে পারেন তার জন্য মডেল আইন প্রণয়ন করার কথা কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মহলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ -আলোচনা শুরু করেছে। সম্প্রতি একটি বৈঠকে নারী ও শিশুকলাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতি মানেকা গান্ধী জানান, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাত্রের সঙ্গে ভারতীয় মহিলাদের বিবাহের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু পারিবারিক হিংসার কারণে ওই মহিলাদের একটা বেশ বড়ো অংশ সন্তান-সহ দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া এন আর আই দম্পতি এবং তাদের সন্তানদের যে অবর্ণনীয় কষ্টের মুখে পড়তে হয়, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মানেকা গান্ধী বলেন, 'আমরা একটি মডেল আইন তৈরি করার কথা ভাবছি। যে আইন শুধুমাত্র বাবা বা মাকে নয়, বাচ্চাদেরও নিরাপত্তা দেবে।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
13 February - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০্ টাকা।।